গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬০ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা ২৫ - ৩১ জুলাই ২০০৮ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

দেশের স্বার্থরক্ষার বুলির আড়ালে কুৎসিত ক্ষমতালিপ্সা

পুঁজিবাদী সংসদীয় গণতন্ত্রের গুণকীর্তনে আমাদের দেশের রথী-মহারথীরা পিছিয়ে নেই। এঁরা প্রায়শই ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থার মহিমা বর্ণনায় গদগদ হয়ে বলেন, গণতন্ত্রের এমন শক্ত ভিত অন্য দেশে নাকি বিরল। আরও বলে থাকেন যে, 'মত প্রকাশের অধিকার', 'সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা', 'নিয়মিত নির্বাচন', 'নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা' ইত্যাদি যা ভারতে আছে তা এদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের শক্তি ও স্বাস্থ্যেরই পরিচয় দেয়। আসলে এই অধিকার, স্বাধীনতা, নির্বাচন, নিরপেক্ষতা প্রভৃতি শব্দগুলো যে নিতান্তই বাইরের রঙচঙে পোশাক, যা দিয়ে ভিতরের কঙ্কালকে আড়ালে রাখা হয়, তা অতীতেও প্রমাণিত হয়েছে, বর্তমানেও দিল্লির রাজনীতি থেকে তা আবার প্রকট হচ্ছে। এ সত্যও স্পষ্ট হচ্ছে যে, সংসদীয় গণতন্ত্রের খেলোয়াড়দের টিকি বাঁধা আছে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের টাকার থলির সাথে এবং রাজনৈতিক সততা ও নৈতিকতার কবরের উপরই এদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের সৌধটি দাঁড়িয়ে আছে।

বর্তমানে দিল্লির রাজনীতিতে যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে, ইউ পি এ সরকার টিকবে কি টিকবে না তা নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে, বলা হচ্ছে, তার মূলে নাকি আছে ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তিকে কেন্দ্র করে দেশের স্বার্থ, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও আদর্শগত প্রশ্ন।

ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তিকে স্বাধীনতা বিপন্নকারী এবং কংগ্রেসের ভূমিকাকে বিশ্বাসঘাতকতা আখ্যা দিয়ে সিপিএম ইউ পি এ সরকারের উপর থেকে সমর্থন তুলে নেয়। ইতিমধ্যে সমাজবাদী পার্টির সমর্থন যোগাড় করে কংগ্রেস দাবি করে, সংসদে তাদের গরিষ্ঠতা আছে। অন্য কোনও দল অনাস্থা প্রস্তাব আনার আগেই কংগ্রেস ঘোষণা করে দেয়, তারাই সংসদে আস্থা ভোট নিয়ে প্রমাণ করবে, ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তির পিছনে সংসদের পূর্ণ সমর্থন আছে।

আস্থা প্রস্তাবের দিন ২২ জুলাই ঘোষণার পরপরই শুরু হল আসল খেলা। কংগ্রেস ও ইউ পি এ-র একদল নামল গরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য এম পি জোগাড়ে, আর এক দল নামল কংগ্রেস যাতে কিছুতেই ২৭১ সংখ্যক এম পি যোগাড় করতে না পারে, তার জন্য যেকোনও ভাবে এম পি ভাঙিয়ে আনার খেলায়। কোটি কোটি টাকার লেনদেন শুরু হয়ে গেল। যে সব দল বা গোষ্ঠীর এমনকী একজন এম পি-ও আছে, বাজারে দর হাঁকা শুরু করল। শুধু ছোট দলগুলির এম পি-রা নয়, সমাজবাদী পার্টি থেকে বিজেপি পর্যন্ত সকল দল থেকেই এম পি ভাঙাবার নোংরা রাজনীতি একেবারে প্রকাশ্যে নগ্ন হয়ে গেল। নীতি ও আদর্শের বুলি আওড়ানো সিপিএম নেতারা ছুটলেন মায়াবতীর কাছে। উদ্দেশ্য একটাই— উত্তরপ্রদেশে সরকারে থাকার সুবাদে তিনি যদি সমাজবাদী পার্টি থেকে কিছু এম পি ভাঙিয়ে আনতে পারেন, এ জন্য রাতারাতি মায়াবতীকে তৃতীয় ফ্রন্টের নেতা বানিয়ে দেওয়া হল। আবার মায়াবতী যখন এ খেলায় নামলেন, তখন সমাজবাদী পার্টি চেষ্টা চালাল মায়াবতীর দল থেকে এম পি ভাঙানোর। অজিত সিং, শিবু সোরেনের মতো নেতারা সকালে কংগ্রেস তো বিকেলে বিজেপির সঙ্গে বৈঠক করে নিলাম হাঁকার মতো নিজেদের দাম বাড়াতে শুরু করলেন। এভাবেই দেখা গেল, কোনও একটি দলও এম পি কেনাবেচার এই বাজারি নিলামের বাইরে থাকল না। ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি যদি এদের কাছে নীতি-আদর্শ রক্ষা, দেশের স্বার্থ রক্ষা বা বিসর্জন দেওয়ার মতো যথার্থই নীতিগত বিষয় হতো, তা হলে এম পি কেনাবেচার মতো নীতিহীন কুৎসিত কাজ তারা করতে পারে না। আসলে এখানে মূল স্বার্থ একটাই— ইউ পি এ সরকার টিকে থাকলে, আর না থাকলে টাকার অঙ্কে ও আগামী ভোটের হিসাবে কার লাভ, কার ক্ষতি। এর সাথে দেশ-নীতি-আদর্শের কোনও সম্পর্ক নেই। সিপিএমের মুখে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা পুরোপুরি ভণ্ডামি।

এম পি কেনাবেচার কারবারে এখন কোনও রাখঢাক নেই, কোনও গোপনীয়তা নেই, সবকিছুই

ছয়ের পাতায় দেখুন

পরমাণু চুক্তি বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ

১৮ জুলাই এস ইউ সি আই-এর ডাকে ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবসে কলকাতায় ধর্মতলা মোড়ে প্রধানমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ

কৃষি যদি ভিত্তি, তবে আলুচাষির এই দুর্দশা কেন

সিঙ্গুরে টাটার জন্য উর্বর কৃষিজমি দখল করতে সরকার যখন নির্মম পাশবিকতায় কৃষকদের প্রতিরোধকে দমন করছে, নন্দীগ্রামে সিপিএম ক্রিমিনাল বাহিনী ও পুলিশের যৌথ আক্রমণে নিহত হচ্ছেন কৃষকরা, ধর্ষিতা হচ্ছেন কৃষক রমণীরা, তখনও সিপিএম নেতারা পাখি পড়ার মতো আওড়ে গিয়েছেন, 'কৃষি আমাদের ভিত্তি'। সেই ভিত্তি নাকি তাঁদের রাজত্বে এতখানি মজবুত হয়েছে যে, তার উপর দাঁড়িয়েই তাঁরা শিল্পায়নের মহাযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এবং সেজন্য নির্বিচারে হাজার হাজার একর কৃষিজমি দখল করতে যাচ্ছেন। বাস্তবে ভিত্তি যদি এতখানি মজবুত হয়েই থাকে, তবে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ আলুচাষির আজ এই প্রবল দুর্দশা কেন? কেন ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে তাঁদের আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হচ্ছে? কী করেছেন সিপিএম নেতারা এই চাষিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য?

একদিকে চাষের জন্য বিপুল খরচ, অপরদিকে উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়ার ফলে রাজ্যের আলুচাষিদের জীবনে নেমে এসেছে চরম বিপর্যয়। জমি থেকে আলু ওঠার মরশুমে কুইন্টাল প্রতি আলুর দাম ছিল ১৫০ টাকা থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত— যা চাষের খরচের থেকে অনেক কম। এ সত্ত্বেও বেশির ভাগ ছোট চাষি বহু কষ্ট স্বীকার করে সে সময়ে আলু বিক্রি না করে হিমঘরে রেখেছিলেন। তাঁদের আশা ছিল, হিমঘর থেকে বের করার সময়ে দাম হয়তো কিছুটা বাড়তে পারে। বাস্তবে দাম বাড়েনি শুধু নয়, হিমঘরের খরচ মিলিয়ে তাঁদের লোকসানের মাত্রাই বেড়ে গিয়েছে।

আলুচাষিদের এই দুরবস্থা এ বছরই প্রথম নয়; গত কয়েক বছর ধরে এ'রকমই চলছে। জমি থেকে আলু তোলার সময়ে অভাবী বিক্রি, মাঠ থেকে না তোলা, ফেলে দেওয়া, কিংবা হিমঘর থেকে আলু বের করার সামর্থ্য না থাকায় তা পচে নষ্ট হওয়া, এ রাজ্যে একটি সাধারণ সমস্যায় পরিণত হয়েছে। সার-বীজ-কীটনাশকের দাম ও সেচের খরচ অত্যন্ত চড়া হওয়ায় আলু চাষের খরচ এখন অত্যন্ত বেশি। আলু চাষের এই বিপুল ব্যয় বহন করতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চাষিদের হয় চড়া সুদে ঋণ করতে হয়, না হলে জমি-জমা, গহনা প্রভৃতি সমস্ত কিছু বন্ধক রাখতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই আলুর দাম না পেলে চাষিদের লোকসান হয় শুধু নয়, ঋণের জালে জড়িয়ে পড়তে হয়। বহু ক্ষেত্রেই একবার এই জালে জড়িয়ে পড়লে চাষি আর নিস্তার পায় না। এই অবস্থায় উপায়হীন হয়ে অনেকেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হন। সিপিএম নেতারা যতই অস্বীকার করুন, ফসলের দাম না পেয়ে চাষির আত্মহত্যার ঘটনা এ রাজ্যে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।

এমন হওয়ার কথা ছিল না। আলু এ রাজ্যের অন্যতম প্রধান ফসল। 'কৃষি আমাদের ভিত্তি' বলে সিপিএমের যে নেতা-মন্ত্রীরা কৃষক দরদের পরাকাষ্ঠা দেখান, তাঁদের ৩১ বছরের শাসনে কী করেছেন তাঁরা আলু চাষিদের জন্য? তাঁদের শাসনে কৃষকদের দুরবস্থা বেড়েছে বই কমেনি। কৃষির জন্য অত্যাবশ্যক সার-বীজ আগে এতখানি দুর্মূল্য ছিল না। আজ সার-বীজ-কীটনাশকের সবগুলিই বহুজাতিক মালিকদের হাতে। তাতে কৃষকদের দুরবস্থা যতই ভয়ঙ্কর হচ্ছে, এই সমস্ত দেশি-বিদেশি কোম্পানিগুলির মুনাফাও তত বাড়ছে। এ বছর আলুর উৎপাদন যে অন্য বছরের তুলনায় বেশি, অর্থাৎ রাজ্যের বাজারে চাহিদা মিটিয়েও তা বাড়তি হবে, এ কথা সকলেরই জানা ছিল। চাষিদের বাঁচাতে হলে অন্য রাজ্যে বা রাষ্ট্রে আলু পাঠানো ছাড়া অন্য কোনও উপায় যে নেই, তাও সকলের জানা ছিল। বোধহয় শুধু রাজ্য সরকারেরই জানা ছিল না। তাই এত কিছু সত্ত্বেও সরকার আলু রপ্তানির কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি।

সাতের পাতায় দেখুন

৫ই আগস্ট

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণদিবসে

স ভা

রানি রাসমণি অ্যাভেনিউ, বিকাল ৪টা

প্রধান বক্তা — কমরেড প্রভাস ঘোষ

সভাপতি — কমরেড প্রতিভা মুখার্জী

কমরেড শিবদাস ঘোষের উদ্ধৃতি প্রদর্শনী

৩ - ৫ আগস্ট স্থান ঃ এসপ্ল্যানেড মেট্রো চ্যানেল

ষষ্ঠ বেতন কমিশন ও ডাক বিভাগের ই ডি কর্মচারীদের সমস্যা নিয়ে আলোচনাসভা

জে পি এ পোস্টাল ইউনিট বসিরহাট শাখার আহ্বানে ১৩ জুলাই বসিরহাট পূর্ণচন্দ্র মজুমদার বালিকা বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ এবং ই ডি কর্মচারীদের জন্য গঠিত নটরাজন কমিটির উপর একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। শতাধিক ডাককর্মী এই সভায় যোগ দেন। জেপিএ-র সর্বভারতীয় সভাপতি অচিন্ত্য সিনহা প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। কর্মচারীরা জানতে চান, ভারতের সুপ্রিম কোর্টের ১৯৭৭ সালের রায় থাকা সত্ত্বেও কেন আজও ই ডি কর্মচারীদের বিভাগীয়করণের ন্যায়সঙ্গত দাবিটির মীমাংসা হল না। বর্তমান নটরাজন কমিটি কি এই সমস্যাটির সঠিক সমাধান করতে পারবে, নাকি আরও বড় ধরনের প্রতারণাই ই ডি কর্মচারীদের জন্য অপেক্ষা করে আছে? ই ডি কর্মচারীদের সমস্যা ষষ্ঠ বেতন কমিশনের বিচার্য বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা গেল না কেন? এর জন্য দায়ী কারা? ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশগুলি কি আদৌ কর্মচারীদের স্বার্থমুখী, না বিরোধী? উপস্থিত ১০ জন কর্মচারী এই ধরনের প্রশ্ন রাখেন। তাঁরা প্রশ্ন তোলেন, সরকারস্বীকৃত সর্বভারতীয় বৃহৎ ট্রেড ইউনিয়নগুলি থাকা সত্ত্বেও সরকারি স্বীকৃতিবিহীন এবং তুলনামূলক ভাবে অনেক কম সাংগঠনিক শক্তি বিশিষ্ট জেপিএ-র পক্ষে এই আন্দোলন পরিচালনা করে দাবি আদায় কি সম্ভব হবে? প্রশ্নগুলি নিয়ে সংগঠকরা আলোচনা করেন। ডাক কর্মচারী আন্দোলনের নেতা নুরুল আলম বলেন, আকারে বড়, কিন্তু সরকারের কর্মচারী স্বার্থবিরোধী নীতি মেনে চলে, এই ধরনের সংগঠন কি কখনও কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে? রাজ্য সম্পাদক তারক দাস বলেন, পঞ্চম বেতন কমিশনের চূড়ান্ত কর্মচারী স্বার্থবিরোধী সুপারিশ যখন নির্দ্বিধায় সরকারি ভাবে স্বীকৃত বড় বড় ইউনিয়নগুলি মেনে নেয়, কর্মচারীদের মানতে বাধ্য করার জন্য চাপ দেয়, তখন কর্মচারী আন্দোলনকে সঠিক দিশায় পরিচালিত করার অঙ্গীকার নিয়েই জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ অ্যাকশন বা জেপিএ-র আবির্ভাব।

প্রধান বক্তা অচিন্ত্য সিনহা বলেন, অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝেছিলাম যে, ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ খুবই বিপজ্জনক ও কর্মচারী স্বার্থবিরোধী হবে। এই সুপারিশ আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে গিয়েছে। বস্তুতপক্ষে, এবারের আক্রমণ অনেক কৌশলি ও ষড়যন্ত্রমূলকই শুধু নয়, বেতন নির্ধারণের প্রশ্নেও চরম বৈষম্যমূলক। একজন গ্রুপ ডি কর্মচারীর বেতন হল ৫ হাজার ৭৪০ টাকা, আর ক্যাবিনেট সেক্রেটারির প্রস্তাবিত বেতন ৯০ হাজার টাকা, সচিবদের ৮০ হাজার ও সেনাপ্রধানদের ৯৬ হাজার টাকা — যা পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত বিরোধী। গ্রুপ ডি পদ তুলে দেওয়ার সুপারিশ শুধু কর্মচারীদের আক্রমণই করবে না, হাজার হাজার বেকারের চাকরি পাওয়ার অধিকার কেড়ে নেবে এবং ই ডি কর্মচারীদের বিভাগীয় হওয়ার পথে চূড়ান্ত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। জনবিরোধী পি আর আই এস-এর নামে কর্মচারীদের মধ্যে এক অসুস্থ প্রতিযোগিতা শুরু করার প্রক্রিয়া চালু হবে। পরিণতিতে কর্মচারীদের মধ্যে অনৈক্য, ভেদাভেদ সৃষ্টি হবে এবং এরই সুযোগ নিয়ে চলবে কর্মী ও কর্মসংকোচন, বেসরকারীকরণ, ঠিকাদারীকরণ এবং অর্জিত অধিকার কেড়ে নেওয়া। কর্মচারীদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত বাধিয়ে দেওয়ার এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বড় বড় সংগঠনের দাবিদাররা নীরব কেন, তার কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি। তবে কি তারাও এর সমর্থক? তিনি একে কর্মচারীদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক তৈরির নীল নক্সা বলে অভিহিত করেন। এছাড়া প্রায় প্রতিটি সুপারিশ, যেমন, অ্যানুয়াল ইনক্রিমেন্ট, ছুটি কমানো, সিজিএইচএস তুলে দেওয়া, বোনাস, পুরনো ও নতুন পেনশন স্কিম ইত্যাদি সবই চূড়ান্ত জনবিরোধী ও প্রতারণামূলক। তিনি এর বিরুদ্ধে ১৯৪৬ সালের ঐতিহাসিক ২৯ জুলাই দিনটি স্মরণ করে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান এবং ঐদিন দিল্লি এবং কলকাতা সহ প্রতিটি রাজ্যের রাজধানীতে ব্যাপক কর্মী সমাবেশ, অবস্থান ও বিক্ষোভের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বলে ঘোষণা করেন।

বিশিষ্ট পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

এস ইউ সি আই-এর সদস্য, কোচবিহার জেলা মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সভানেত্রী কমরেড বনানী ঘোষ (৭০) ৭ জুলাই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মে মাসে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর কিছুটা সুস্থ হলেও আবার ৩০ জুন তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। অবশেষে ৭ জুলাই তাঁর জীবনাবসান ঘটে। তাঁর মরদেহ কোচবিহার এস ইউ সি আই জেলা কার্যালয়ে শায়িত রাখা হয়। মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান, জেলা সম্পাদক কমরেড শিশির সরকার ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ। এম এস এস, অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি, ডি এস ও, ডি ওয়াই ও প্রভৃতি গণসংগঠনের পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হয়। জেলার বিশিষ্ট নাগরিক ত্রিকুলেন্দ্র নারায়ণ, অজয় মুখার্জী প্রমুখ মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। এরপর মিছিল সহকারে তাঁর মরদেহ শেষকৃত্যের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

৬০-এর দশকের শেষ পর্বে কমরেড সত্যেন ঘোষের সাথে বিবাহসূত্রে কমরেড বনানী ঘোষ জলপাইগুড়িতে আসেন। ডাক ও তার বিভাগের কর্মী সত্যেন ঘোষ তখন সবেমাত্র সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে এসে দলের সাথে যুক্ত হয়েছেন। এরপর কমরেড বনানী ঘোষ প্রথমে দিনহাটা ও পরে কোচবিহারে ধীরে ধীরে দলের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী ও সমর্থক থেকে পরবর্তীকালে দলের কর্মী ও মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের জেলা সভানেত্রী স্তরে উন্নীত হন।

দলের কর্মীদের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ ভালবাসাই তাঁকে অনন্য করে তোলে। যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, এই ভালবাসার উষ্ণতা অনুভব করেছেন। সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের সর্বনাশা ভাষা-শিক্ষানীতি ও বাসভাড়া বৃদ্ধিবিরোধী আন্দোলন থেকে নারী নির্যাতনবিরোধী আন্দোলন সহ বহু আন্দোলনেই তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগেও তিনি কোচবিহার জেনকিন্স স্কুলে অভিভাবকদের নিয়ে আন্দোলন করে তথাকথিত জীবনশৈলী শিক্ষা রুখে দিয়েছেন। চরম রোগকষ্ট নিয়ে এবার যখন তিনি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন, তখন তাঁর আত্মীয় একজন ডাক্তার তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। সেই অবস্থাতেও তাঁকে তিনি বলেন, ''অন্য কিছু করতে না পার তো দলের ছেলেমেয়েগুলোকে একটু দেখো''। একজন সাধারণ গৃহবধূর স্তর থেকে দল ও জনগণের প্রতি ভালবাসাকে অবলম্বন করে নিজেকে বিপ্লবী দলের একজন কর্মী-সংগঠকে কীভাবে উন্নীত করা যায়, কমরেড বনানী ঘোষের জীবনসংগ্রাম তারই প্রকৃষ্ট নিদর্শন। মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর বাড়িটিও দলের হাতে তুলে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে গেছেন।

১৫ জুলাই কোচবিহার ক্লাবে জেলা মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য এবং এম এস এস-এর রাজ্য সভানেত্রী কমরেড সাধনা চৌধুরী বলেন, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বলতেন, রাজনীতি শুধু বুদ্ধির কারবার নয়, রাজনীতি একটা উচ্চ হৃদয়বৃত্তি। এই হৃদয়বৃত্তিরই প্রতিফলন ঘটেছে কমরেড বনানী ঘোষের জীবনে। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন এস ইউ সি আই কোচবিহার জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সত্যেন ঘোষ ও কমরেড কাজল চক্রবর্তী। এছাড়া বক্তব্য রাখেন, কমরেড নাজিরা খন্দকার, এম এস এস-এর জেলা সম্পাদিকা কমরেড রীনা ঘোষ, অগ্রগামী মহিলা সমিতির পক্ষে কমরেড ছন্দা ঘোষ, জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের পক্ষে শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী মুখার্জী। বিভিন্ন গণসংগঠন ও ব্যক্তির পক্ষ থেকে কমরেড বনানী ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। সভা পরিচালনা করেন প্রাক্তন শিক্ষিকা শ্রীমতী সাধনা চৌধুরী।

কমরেড বনানী ঘোষ লাল সেলাম!

ভাড়াবৃদ্ধি ঃ ১৫ জুলাই বিধানসভার সামনে এস ইউ সি আইয়ের বিক্ষোভ

এস এফ আই-এর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জয়

১৪ জুলাই মাথাভাঙা কলেজে প্রথম বর্ষের ভর্তির সময় এস এফ আই জোর করে ছাত্রদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করতে গেলে স্টুডেন্টস ফোরামের কর্মীরা বাধা দেয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে এস এফ আই কর্মীরা বহিরাগত সমাজবিরোধীদের সাথে নিয়ে ডি এস ও কর্মী বি এ তৃতীয় বর্ষের ছাত্র, ফোরামের সদস্য লক্ষ্মণ মণ্ডল এবং ফোরামের আর এক কর্মী রফিক হোসেনের উপর লাঠিসোঁটা নিয়ে নৃশংস আক্রমণ চালায়। আঘাতে দু'জনই তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হয়ে যান। তাঁদের প্রথমে মহকুমা হাসপাতালে এবং পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এস এফ আই দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার, আবেদনকারী সমস্ত ছাত্রের ভর্তি এবং কলেজে গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষার দাবিতে ফোরাম পরের দিন ১৫ জুলাই থেকে অনির্দিষ্টকাল কলেজ ধর্মঘটের ডাক দেয়। আন্দোলনের চাপে মহকুমা শাসক, ফোরাম ও কলেজ কর্তৃপক্ষকে নিয়ে বৈঠকে বসে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে এবং এস এফ আই-এর জোনাল সম্পাদক সঞ্জয় দত্তকে গ্রেপ্তার করলে ঐ দিন সন্ধ্যায় ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

সিংকোনা বাগিচার বিদ্যুৎগ্রাহকদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবি জানাল অ্যাবেকা

রংগো, দলগাঁও ইত্যাদি সিংকোনা বাগিচার বিস্তীর্ণ এলাকায় বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিতে সারা বাংলা বিদ্যুৎগ্রাহক সমিতি রংগো শাখার পক্ষ থেকে ১২ জুলাই জলপাইগুড়ি ডিভিশনের ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ারের নিকট স্মারকলিপি পেশ করা হয়। স্মারকলিপিতে (১) ধসপ্রবণ এলাকায় বিপজ্জনকভাবে হেলে যাওয়া বিদ্যুতের খুঁটিগুলি উপযুক্তভাবে প্রতিস্থাপন, (২) আবেদনকারী প্রত্যেককে অতি দ্রুত বিদ্যুৎসংযোগ দেওয়া, (৩) অচল ও খারাপ মিটার পরিবর্তন করে নতুন মিটার দেওয়া, (৪) উক্ত অঞ্চলের বিদ্যুৎ সরবরাহ সঠিক রাখতে সর্বক্ষণের জন্য বিদ্যুৎকর্মী বহাল, (৫) লো-ভোল্টেজ/লোডশেডিং বন্ধ, (৬) শীতকালে পাহাড়ে সস্তায় গরিব মানুষকে বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং (৭) বিদ্যুতের মাশুল হ্রাস করা প্রভৃতি দাবি করা হয়।

প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন রংগো শাখার সভাপতি এল এম শর্মা, ওয়াংদি শেরপা, সন্তোষ গুরুঙ এবং মনোজ গুরুঙ। প্রতিনিধিবৃন্দ জানান, সংশ্লিষ্ট আধিকারিক বলেছেন, অতি দ্রুত সেখানে একটি তদন্তকারী টিম পাঠানো হবে।

বীরভূমে কৃষিসারের কালোবাজারি রুখে দিল এস ইউ সি আই

বীরভূমের ময়ূরেশ্বর ১নং ব্লকের কোটাসুর সমবায় সমিতি এক লরি ১০ ঃ ২৬ ঃ ২৬ সার পাচার করছিল জেলারই খয়রাশোলে। কিন্তু ময়ূরেশ্বর এস ইউ সি আই থানা কমিটির সক্রিয় সদস্য কমরেড লুৎফার রহমান এবং উত্তম কুণ্ডু এলাকার কৃষকদের সংগঠিত করে লরিটিকে ১৮ জুলাই বেলা ১১টা থেকে ২টো পর্যন্ত আটকে রাখে এবং পুলিশ-প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শেষ পর্যন্ত ময়ূরেশ্বর ব্লকের কৃষি আধিকারিক উপস্থিত হয়ে ২১ জুলাই ঐ সার কৃষকদের মধ্যে বিলি করার প্রতিশ্রুতি দেন। এতে এলাকার কৃষকরা খুশি।

এস ইউ সি আই লাভপুর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে রাসায়নিক সারের কালোবাজারি রুখতে ১৭ জুলাই লাভপুর ব্লকের এডিও-কে প্রতিনিধিত্বমূলক ডেপুটেশন দেওয়া হয়; নেতৃত্ব দেন কমরেডস লালন দাস ও জাকির হোসেন। এরপর এডিও এলাকার কয়েকটি দোকানে অভিযান চালান এবং প্রত্যেক দোকানদারকে সরকারি মূল্যে সার বিক্রি করার কড়া আদেশ দেন; অন্যথায় লাইসেন্স বাতিলের হুমকি দেন। প্রবল জনমত ও প্রশাসনের এই তৎপরতায় লাভপুর ব্লকের সার ব্যবসায়ীরা সরকারি মূল্যে সার বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে।

পরমাণু চুক্তি ঃ সিপিএমের নকল বিরোধিতার প্রতিবাদে বিধানসভায়

এস ইউ সি আই-এর ওয়াক আউট

১৭ জুলাই, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সিপিআই (এম) বিধায়ক রবীন মন্ডল ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তির বিরুদ্ধতা করে একটি প্রস্তাব সভায় আলোচনার জন্য উত্থাপন করেন। ঐ প্রস্তাব সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এস ইউ সি আই-এর পরিষদীয় নেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার বলেন —

"আমরা ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী এবং এই চুক্তিকে চূড়ান্ত করার জন্য কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকার সম্প্রতি যে উদ্যোগ নিয়েছে, আমাদের দল এস ইউ সি আই শুরু থেকেই তার তীব্র নিন্দা করেছে এবং সিপিআই(এম) সহ সমস্ত বাম-গণতান্ত্রিক দলগুলির কাছে এই চুক্তিকে প্রতিহত করার জন্য দেশব্যাপী তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলার আবেদন করে এসেছে। দুঃখের হলেও এ কথা সত্য, আমরা সেই আবেদনে কোনও সাড়া পাইনি। আপনারা সকলেই জানেন, এই চুক্তি ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষী শাসক একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সামগ্রিক স্বার্থে রচিত। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ভাঙনের পরই ভারতের শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী আঞ্চলিক সুপার পাওয়ার হিসাবে, তথা একটা বিশ্বশক্তি হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের মদত পেতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। এই উদ্দেশ্যেই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এমনকী সামরিক ক্ষেত্রেও আমেরিকার সাথে আঁতাত গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। আমেরিকাও তার নিজস্ব সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ভারত সরকারকে ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসাবে পাওয়ার জন্য এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে এগিয়ে আসে। বলা বাহুল্য, এই চুক্তিকে ভারতের সমস্ত কর্পোরেট সংস্থা ও একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠী বিপুল ভাবে সমর্থন জানিয়েছে। ২০০৫ সালের জুলাই মাসে যখন সিপিএমের পূর্ণ সমর্থনে পরিচালিত ইউ পি এ সরকার আমেরিকার সাথে ১০ বছরের 'ডিফেন্স ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট'-এ স্বাক্ষর করেছিল, তাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী এক যৌথ বিবৃতিতে পরমাণু চুক্তির মূল কাঠামোটি কী হবে, তা ব্যাখ্যা করেছিলেন। এর পর ২০০৬ সালের জুলাই মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ভারত সফরে এসে সিপিএমের কোনরকম বিরুদ্ধতা ছাড়াই ভারতের সাথে একটি অসামরিক পরমাণু সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য প্রতিটি জনস্বার্থবিরোধী নীতির ক্ষেত্রে সিপিএম যে ভূমিকা দেখিয়েছে, পরমাণু চুক্তির প্রশ্নেও যদি তা না করত, অর্থাৎ মুখে বিরুদ্ধতার ভান করে তলে তলে সমর্থন না করে যেত, তা হলে এই চুক্তি নিয়ে সরকারের পক্ষে এগোনো সম্ভব ছিল না। এই চুক্তির বিষয়ে কোন সময়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তার সবটাই সিপিএমের জানা থাকা সত্ত্বেও তাদের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল কেন্দ্রীয় সরকারকে এ থেকে বিরত করার জন্য বাস্তবে কোনও কিছুই তারা করেনি। তারা সত্যিই যদি পরমাণু চুক্তির বিরোধিতা চাইত, তা হলে সংসদের ভেতরে ও বাইরে সর্বাত্মক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলাই ছিল তাদের অবশ্যকর্তব্য। তিন বছর আগেই যখন পরমাণু চুক্তির প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা শুরু হয়, তখনই তারা এর বিরুদ্ধতা করে ঘোষণা করতে পারত যে, এ বিষয়ে সরকার আর এগোলেই তারা সমর্থন তুলে নেবে। কিন্তু তা না করে বাম-ইউ পি এ সমন্বয় কমিটিতে চুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করার এবং 'একের পর এক অভিমত বুঝে নেওয়ার' অজুহাতে সিপিএম নেতারা কেন্দ্রীয় সরকারকে চুক্তি করার পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচুর সময় দিয়েছে শুধু নয়, চুক্তি অনুমোদনের জন্য আই এ ই এ-তে যাওয়ার ছাড়পত্র পর্যন্ত দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইউ পি এ সরকার আই এ ই এ-তে ইরানের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া সত্ত্বেও সিপিএম লোকদেখানো অসন্তোষ প্রকাশ করা ছাড়া কিছুই করেনি। প্রথমে পশ্চিমবঙ্গে এবং পরে বঙ্গোপসাগরে মার্কিন সেনার সাথে ভারতীয় সেনার যৌথ সামরিক মহড়ার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদের ভান করে সিপিএম তা অবাধে চলতে দিয়েছে। তাই তিন বছর আগে এই চুক্তির প্রস্তাব প্রথম জনসমক্ষে আসার পরের ঘটনাবলী খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, এই চুক্তির কোনও যথার্থ বিরুদ্ধতার জন্য সিপিএম বর্তমানে ইউ পি এ সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করেনি, সম্পূর্ণ ভিন্ন লক্ষ্য ও স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্যই এটা করেছে। এখন লোকসভা নির্বাচন যেহেতু আসন্ন এবং পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরায় সিপিএমকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়তে হবে, তাই নিজেদের নষ্ট হওয়া বামপন্থী ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করতে এবং ইউ পি এ সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে মানুষের চাপা বিক্ষোভকে ভোটে ব্যবহার করে ফয়দা তুলতে সিপিএম নেতারা কংগ্রেসবিরোধী আলখাল্লা গায়ে চাপানোর জন্য সরকার থেকে সমর্থন তুলে নিয়েছে। ফলে এই বিচ্ছেদ সাময়িক। তাঁরা নিজেরাই বলছেন যে, ভোটের পরে প্রয়োজন হলে তাঁরা আবার কংগ্রেসকে সমর্থন করবেন।

তাই বিধানসভায় প্রস্তাবিত পরমাণু চুক্তির এই নকল বিরোধিতার নাটকে বিভ্রান্ত না হয়ে এই গোপন চুক্তি বাতিল করার জন্য দেশব্যাপী তীব্র প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে সিপিএমের সৎ কর্মী-সমর্থক সহ জনগণকে এগিয়ে আসার জন্য আমাদের দল এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছি এবং সভায় প্রস্তাবিত 'নাটকের' বিরোধিতা করে আমাদের দলের পক্ষ থেকে সভাকক্ষ ত্যাগ করছি"।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি

গত ২৭ মে থেকে ১৩ জুন, জেনেভায় আই এল ও-র আহ্বানে আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে এবং সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শংকর সাহা এই সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেন। অন্যান্যদের মধ্যে ভারতবর্ষ থেকে হাসুভাই ডাভে (বি এম এস), শ্রী আদ্যন্তয়া (আই এন টি ইউ সি), কমরেড স্বদেশ রায় (সি আই টি ইউ) যোগদান করেন।

এবারের সম্মেলন নানা দিক থেকেই ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ ১৮ দিন ধরে বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এই সম্মেলনে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়। কমরেড শংকর সাহা এইসব আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনকক্ষের বাইরেও নানা দেশের প্রতিনিধিদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ও দ্বিপাক্ষিক আলাপ-আলোচনা হয়। অতীতের মতো এবারেও অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার আলোকে অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি'র বিশ্লেষণ তাঁদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। তাঁরা আকর্ষণ অনুভব করছেন এবং বহু দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ ভবিষ্যতে সংযোগরক্ষা, পারস্পরিক মত বিনিময় এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে একত্রে কাজ করার অভিমত প্রকাশ করেছেন। নানা দেশের গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিক সংগঠন তাদের নিজ নিজ দেশে অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি'কে আমন্ত্রণও জানিয়েছে।

বিশ্ব-ত্রিপাক্ষিক সংস্থা আই এল ও'র এই সম্মেলন মঞ্চ থেকে একটা বিষয় পুনরায় পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে যে, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ তাদের সংকট নিরসনের জন্য, বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পরে একমেরু বিশ্বে বিশ্বায়ন-বেসরকারীকরণ-উদারীকরণ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সমস্যার সমাধানের যে স্বপ্ন দেখেছিল — অচিরেই প্রমাণিত হল যে, তা সম্ভব নয়। বরং সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে সংকট আরও তীব্র হয়েছে; পাশাপাশি সমস্ত শোষণ-জুলুম-অত্যাচার-রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব হরণ, যুদ্ধ-আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন আবার মাথাচাড়া দিয়েছে। বিশেষ করে ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা, মধ্য ও পূর্ব এশিয়ার দেশের জনগণ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী তো বটেই, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় প্রবলভাবে সোচ্চার। একথা ঠিক যে, গড়ে-ওঠা এইসব শ্রমিক-মেহনতি জনতার আন্দোলনের মধ্যে কিছু ঘাটতি আছে, তার মধ্যে প্রধান ঘাটতি হল স্বতঃস্ফূর্ততা। এইসব আন্দোলন প্রায় সর্বত্র সঠিক শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি, মতাদর্শ ও পরিকল্পনার ভিত্তিতে সংগঠিত হচ্ছে না। আন্তর্জাতিক এমন এক প্রেক্ষাপটে ৯৭তম সম্মেলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

মূল আলোচ্য বিষয়, 'সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার' প্রসঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে কমরেড শংকর সাহা বলেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অভ্যন্তরেও শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত হওয়ার এবং তার দাবিদাওয়া অর্জন ও ন্যায়সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে দরকষাকষির অধিকার মৌলিক মানবিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত হলেও এবং আই এল ও তাকে জীবন-জীবিকা ও অস্তিত্ব রক্ষার প্রধান অবলম্বন বলে মনে করলেও তা আজ গোটা বিশ্বে পদদলিত হচ্ছে। তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বে দেশে দেশে মানুষ যদি স্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায়বিচার, সামাজিক সুরক্ষা ও মানবিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হ'ন, তাহলে শ্রমিকশ্রেণীর এই অধিকারগুলি সঠিক অর্থে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে অন্যান্য দেশের সাথে কলম্বিয়ার উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, কলম্বিয়ার সরকার দেশকে একটি সামরিক কারাগারে পরিণত করেছে এবং ন্যায়সংগত শ্রমিক আন্দোলনের উপর আক্রমণ একটি প্রাত্যহিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এ পর্যন্ত ২,২৬৯ জন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। বিগত ৫ মাসে কম করে ২৬ জন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। কোন আধুনিক সভ্য সমাজে এভাবে গণহত্যা সম্ভব হতে পারে না, যদি রাষ্ট্রশক্তির সমর্থন ও মদত না থাকে। আর এ কারণেই প্রায় একশ' শতাংশ হত্যাকাণ্ডেরই অনুসন্ধান ও অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা কখনও হয়নি। তিনি বলেন, দেশীয় একচেটিয়া পুঁজি ও বহুজাতিক পুঁজি অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সারা বিশ্বজুড়ে নিজ নিজ বাজার দখলের তাগিদে আজ তীব্র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ। এমন পরিস্থিতিতে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা ও সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের পথে অন্তরায় হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন, তাঁদের মানবিক অধিকার ও মূল্যবোধের স্বীকৃতি।

উন্নত ও পশ্চাদ্‌পদ সব পুঁজিবাদী দেশে আজ 'বিশ্বায়ন' নিয়ে হৈ-চৈ চলছে এবং বিশ্বায়নের 'ভাল দিক' অনুসন্ধানে অনেকে ব্যস্ত। কমরেড শংকর সাহা এক বিতর্কে অংশ নিয়ে বলেন যে, 'বিশ্বায়ন' বিগত এক দশকের মধ্যে বিশ্বব্যাপী বেকারি, কর্মসংকোচন, মজুরি সংকোচন, আউটসোর্সিং, ঠিকাদারীকরণ, ক্যাজুয়াল ব্যবস্থা — এককথায় শোষণের তীব্রতা ও জীবনজীবিকার অনিশ্চয়তাকে আরও বাড়িয়েছে। বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় সমস্ত 'ফর্মাল সেক্টর'কে 'ইনফর্মাল সেক্টরে' পরিণত করে মোট শ্রমশক্তির ৯৪ শতাংশকে ইনফর্মাল করে দিয়ে ন্যূনতম মজুরির অধিকার, কাজের নিশ্চয়তা, সার্ভিস কন্ডিশন, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি অধিকার ও সুযোগসমূহ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। আই এল ও'র হিসাবমত বিশ্বে আজ ১৩০ কোটি শ্রমিকের দৈনিক গড় আয় ১ ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ৪০ টাকা) এবং ৩০০ কোটি লোক দৈনিক গড়ে ২ ডলার উপার্জন করেন। আর তীব্র বেকারত্বের মধ্যে এইসব শ্রমিক সর্বনিম্ন মজুরিতে কাজ পাওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতায় নিজেদের নিঃশেষ করে দিচ্ছেন। লক্ষণীয় যে, সংকটে জীর্ণ, মুমূর্ষু পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষায় দেশে দেশে সরকার এস ই জেড গঠন করছে। শ্রমজীবী জনগণের ঘাম, রক্ত, মর্যাদা ও মনুষ্যত্বের বিনিময়ে এসব করা হচ্ছে। প্রচলিত শ্রম আইন ও আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত শ্রমিক অধিকারসমূহ কবরস্থ করে মালিকদের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে এবং মুনাফার পরিমাণ আরও উচ্চ করতে এসব করা হচ্ছে। আই এল ও'র হিসাবমত বিশ্বে ১ কোটি ২৩ লক্ষ ফোর্সড লেবার (বেগার শ্রমিক) রয়েছে — যারা অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও যৌন শোষণের শিকার হয়েছে।

আই এল ও'র আর একটি পরিসংখ্যান বলছে, এইসব ফোর্সড লেবার (নারী, শিশু উভয়ই) পাচার করে বার্ষিক ৩১৬৫.৪ কোটি মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা) মালিকরা উপার্জন করছে। এই ব্যবসার সিংহভাগে শিল্পোন্নত দেশগুলির মালিকরাই জুড়ে আছে।

আজ উন্নত-অনুন্নত এমন কোনও দেশ খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে শিশুশ্রমিক ব্যবহৃত হচ্ছে না এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে চরম ক্ষতিকর কাজে তাদের নিয়োগ করা হচ্ছে না।

তিনি বলেন, এই যখন বিশ্বে শ্রমিকদের পরিস্থিতি ও তাঁদের সামাজিক অবস্থান, তখন সংগঠনের অধিকার এবং মালিক ও সরকারের সাথে দরকষাকষির অধিকারের প্রশ্নে এই আলোচনার মূল্য কতটুকু? উপরন্তু তথাকথিত জনকল্যাণকামী(!) 'বিশ্বায়ন' কর্মসূচি শ্রমিকদের অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষায় কী কাজে লাগতে পারে!

৯৭তম সম্মেলনের মঞ্চ থেকে গভীর বেদনার সাথে তিনি উল্লেখ করেন যে, শ্রমিকশ্রেণীকে নির্বীর্য ও পঙ্গু করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিশ্বায়নের আক্রমণ শিক্ষা-সংস্কৃতি-নৈতিকতার উপরও নামিয়ে আনা হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীকে অমানুষ করে দেওয়ার বিশ্বব্যাপী একটা প্রচেষ্টা, একটা প্রক্রিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছে। একদিন দেখা যাবে, শ্রমিকরা অর্থনীতিসর্বস্ব মনুষ্যেতর প্রাণীতে পরিণত হয়েছে — যারা চরিত্রে, বৈশিষ্ট্যে চরম স্বার্থপর, রোবটতুল্য মানুষে পরিণত হয়েছে, যারা শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা, মনুষ্যত্ব ও মর্যাদাবোধের প্রয়োজনে আর সংগ্রাম করার প্রয়োজন উপলব্ধি করবে না।

সম্মেলনের মঞ্চ থেকে তিনি বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, শ্রমিকশ্রেণী, যারা এই সভ্যতার স্রষ্টা, তাদেরকে বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ঐতিহাসিক শিক্ষা নিতে হবে যে, শ্রমিকরা যে অধিকার ভোগ করছেন তা কারও কোন দয়ার দান নয়। এসবই শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীসংগ্রামের দ্বারা অর্জিত অধিকার। লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের আত্মদানের বিনিময়ে, এমনকী সমাজের আমূল পরিবর্তনের সংগ্রামের পথে একটি একটি করে তাকে এই অধিকার অর্জন করতে হয়েছে। ভুলে গেলে চলবে না যে, যে অধিকার হারিয়ে গিয়েছে, তাকে পুনরায় অর্জন করতে হলে যে সমাজব্যবস্থা শোষণের উৎস, প্রতিবন্ধক, তার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম ব্যতীত তা কখনও অর্জন করা সম্ভব নয়।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রকৃত উপলব্ধির মানে হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত দ্বন্দ্বমূলক বিচারপদ্ধতি আয়ত্ত করা

— শিবদাস ঘোষ

[৫ই আগস্ট সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবস উপলক্ষে 'নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা ও ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলন' শীর্ষক তাঁর ভাষণের অংশবিশেষ এখানে প্রকাশিত হল।]

... মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রকৃত উপলব্ধি কথাটার মানে কী? এই 'প্রকৃত' বলতে আমরা কী বুঝি? যুক্তিসম্মত আলোচনায় পাওয়া যাবে যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রকৃত উপলব্ধি কথাটার যথার্থ মানে হচ্ছে, সঠিক বিজ্ঞানসম্মত বিচারপদ্ধতি, অর্থাৎ, বিজ্ঞানসম্মত দ্বন্দ্বমূলক বিচারপদ্ধতি। এই সঠিক বিচারপদ্ধতি বাদ দিয়ে কোনও একটা বিষয়ে আলোচনায় যদি মনে হয়, এটাই 'প্রকৃত' এবং তাকে কেন্দ্র করে ঐক্যও হয়, তবে তাতে লাভ হয় না। আজ যেটা মনে হল প্রকৃত, কালই আবার একটা ঘটনায় দেখা যাবে, সমস্তটাই গোলমাল হয়ে গেল। এতে যেটা হয়, তা হচ্ছে, সাময়িক ঐক্য। এর নামই হল, সাধারণ ঐকমত্যে পৌঁছানো। কিন্তু, এ ঘটনা তো দুটো সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ চিন্তাপদ্ধতির লোকের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। তারাও তো অনেক সময় অনেক ইস্যুতে আপাতদৃষ্টিতে ওপর ওপর সাধারণ ঐক্যে আসে। একেবারে দুই বিপরীত মেরুর দর্শনের ব্যক্তিরাও একটা সাধারণ ইস্যু'র উপর একটা মোটামুটি বিচারধারায় ঐক্যবদ্ধ হয়, একত্রে কাজ করে। না হলে, বিভিন্ন দল ও শক্তির যুক্তফ্রন্ট হয় কী করে? এইভাবে কোনও একটা সাধারণ ইস্যু'র উপর ঐক্য করাটাই তো যুক্তফ্রন্ট রাজনীতির মূল কথা। কিন্তু, এই মাপকাঠিতে তো একটা পার্টি প্রকৃতই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি কি না, তার বিচার হয় না। একটা পার্টি প্রকৃতই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি কি না, তার মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উপলব্ধিটা সঠিক কি না, তা যদি আমরা বোঝার চেষ্টা করি, তাহলে সেই পার্টির বিচারপদ্ধতি কী, চিন্তাপ্রক্রিয়া কী রকম — অর্থাৎ, সেটা সঠিক মার্কসবাদ-লেনিন ভেঙে পরে সি পি আই(এমএল) হল। অবশ্য, সি পি আই(এমএল) দ্রুত ভেঙে শেষ হয়ে যাচ্ছে। সি পি আই ও সি পি আই(এম) এই যে একই পার্টি ভেঙে দুটো পার্টি আমাদের দেশে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নাম নিয়ে দাঁড়াল, আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের স্বীকৃতি ও গৌরবকে ভিত্তি করে বড় পার্টি হয়ে গেল, তাদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে উপলব্ধি কী? এই আসল জায়গাটাই কেউ বিচার করে পরিষ্কার করে নিতে চায় না। তাদের রাজনৈতিক প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তগুলো বিচার করতে গিয়েও আমরা প্রতিপদেই দেখছি যে, ছোটখাটো দু'চারটে বিষয় ছাড়া মূল বক্তব্য, রাজনৈতিক বক্তব্য তাদের আগাগোড়াই ভুল। ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, বিপ্লবের স্তর, আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী নেতৃত্ব সম্পর্কে ধারণা, ইত্যাদি যেকোন মূল বিষয়ে বিচার করলেই দেখা যাবে, এ সম্পর্কে সি পি আই, সি পি আই(এম)-এর বক্তব্য, বিশ্লেষণ, তত্ত্ব সবই ভুল।

কিন্তু, আমি এর চেয়েও আর একটা মূল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কারণ, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব বলতে কেবল বিপ্লবের স্তর নির্ধারণটা সাধারণভাবে সঠিক হওয়াই বোঝায় না। যদিও বিপ্লবের স্তরটি সঠিকভাবে নির্ধারণ করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিপ্লবের কর্মসূচি নিয়ে যে দলকে জনগণের মধ্যে গিয়ে কাজ করতে হয়, জনগণকে সংগঠিত করতে হয়, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনে টেনে আনতে হয়, তার কাছে রাষ্ট্রের চরিত্র কী, বিপ্লবের স্তর কী, কোন শ্রেণীকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে কোন কোন শ্রেণী মিলে উচ্ছেদ করবে — এই প্রশ্নগুলো অত্যন্ত জরুরি, এগুলো অন্যতম মূল বিষয়। এগুলো ছাড়া একটা রাজনৈতিক আন্দোলন দাঁড়াতেই পারে না। এগুলো হল একটা রাজনৈতিক আন্দোলনের সামনে বিপ্লবী তত্ত্বের বিশেষীকৃত রূপ। কিন্তু, আমি বলতে চাইছি, এই জায়গায় যদি দুটো রাজনৈতিক দলের মিল হয়ে যায়, তাহলেই কি বলা যাবে, তত্ত্বের মিল হয়ে গেল? অনেকে বলবেন, মিল হল। আমি মনে করি, না। শুধু এই দিয়ে মিল হয় না। যেমন, আমরা এস ইউ সি আই বলি যে, ভারতবর্ষ একটি পুঁজিবাদী দেশ এবং এখানে বিপ্লবটা হবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এই কথাটা আমাদের দেশে আর এস পি বলে, ওয়ার্কার্স পার্টি বলে, আর সি পি আই-ও বলে থাকে। এমন ব্যক্তিও দেশে পাওয়া যাবে, তত্ত্ব বোঝেন বলে যাঁদের অহমিকা আছে, তাঁদের প্রশ্ন করা হলে তাঁরাও বলে দেবেন, 'ভারতবর্ষ একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, এখানে ক্ষমতায় আছে বুর্জোয়াশ্রেণী, তাদের উচ্ছেদ করবে শ্রমিক-চাষি-নিম্নমধ্যবিত্ত, নেতৃত্ব দেবে সর্বহারা, বিপ্লবটা এখানে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।' ব্যস, তাহলেই কি এসব দল ও ব্যক্তির সাথে এস ইউ সি আই-এর মূল বক্তব্য মিলে গেল, তত্ত্ব মিলে গেল — এ কথা বলা যায়? না, বলা যায় না। এই মিল আছে কি না দেখতে গেলে দেখতে হবে, প্রত্যেকের বিচারপদ্ধতি, চিন্তাপ্রক্রিয়া, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মূল নীতিগুলোর সর্বব্যাপক ক্ষেত্রে উপলব্ধি, যৌথ চিন্তা বা যৌথ নেতৃত্ব এবং তার বিশেষীকৃত প্রকাশ — এইসব মূলগত বিষয়ে চিন্তাগত ভিত্তি এক কি না, অর্থাৎ, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে ধ্যানধারণাগুলো মূল যে চিন্তাগত ভিত্তি থেকে জন্ম নিচ্ছে, সেই ভিত্তিটা এক কি না।

এখন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এই যে প্রকৃত উপলব্ধি, অর্থাৎ, সঠিক বিচারপদ্ধতি (methodology), এটা মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের বই মুখস্থ করে আয়ত্ত করা যায় না। রাশিয়াতেও অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি মার্কস-এঙ্গেলসের কোটেশন আউড়ে রাশিয়ার সমাজ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাশিয়ার বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। তাঁরাও মুখে বলেছিলেন, মার্কসবাদ একটা সূত্রবাদ (dogma) নয়, কিন্তু, বাস্তব বক্তব্যে ও কার্যকলাপে তাঁরা তাকে সূত্রবাদেই পরিণত করেছিলেন। মার্কস তাঁর সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভেবেছিলেন যে, সর্বহারা বিপ্লব প্রথমে অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলিতেই হবে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার তখনকার উদারনৈতিক পরিবেশ দেখে মার্কস এমন কথাও বলেছিলেন যে, ঐসব দেশে বিপ্লব শান্তিপূর্ণ উপায়ে হবে। রাশিয়াতে অনেক মার্কসবাদী পণ্ডিত মার্কসের ঐ কথাগুলো আউড়ে বিপ্লব বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। এঁদের সঙ্গে লেনিনকে তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রামে নামতে হয়েছিল। লেনিন বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী যুগের সঙ্গে মার্কসের যুগের পার্থক্য কী, এবং সেই পার্থক্য অনুযায়ী কেন এ যুগে বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলোর বদলে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলের সবচেয়ে দুর্বল স্থানগুলিতে এসে যাবে এবং সেখানেই বিপ্লব হবে, তা দেখালেন। লেনিন তত্ত্বগতভাবে এও দেখালেন যে, আজকের যুগে বুর্জোয়ারা যখন গণতন্ত্রের চেয়ে সামরিকবাদ ও আমলাতন্ত্রের দিকেই বেশি ঝুঁকেছে, তখন প্রতিটি দেশে বিপ্লব সশস্ত্র হতে বাধ্য। এসব বিষয় ছাড়াও সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র ও রূপ, কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন, তার গণতন্ত্রের ধারণা, সর্বহারা একনায়কত্ব, সর্বহারা বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা, চাষির ভূমিকা, ইত্যাদি নানা মূল বিষয়ে প্লেখানভ, ট্রটস্কি, কাউটস্কি ও অন্যান্যদের সঙ্গে লেনিনের তীব্র বিতর্ক হয়। এই বিতর্ক কেন হল? সকলেরই তো মার্কস-এঙ্গেলস-এর বইগুলো কণ্ঠস্থ ছিল, তাহলে বিতর্ক হল কেন? কারণ, একদল কেবল মার্কস-এঙ্গেলসের বাণীগুলোকে, সিদ্ধান্তগুলোকেই তত্ত্ব বলে ধরে নিয়েছেন। আর, লেনিন মার্কসবাদের তত্ত্ব বলতে মার্কস-এঙ্গেলসের কথাগুলো, বা তাঁদের সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যে সিদ্ধান্তগুলো তাঁরা করেছিলেন, শুধু সেগুলোকে মনে করেননি। তিনি ধরেছেন — যে বিজ্ঞানটাকে, যে বিচারবিশ্লেষণ পদ্ধতিকে প্রয়োগ করে মার্কস একটা সময়ে সিদ্ধান্তগুলো করেছিলেন, সেই বৈজ্ঞানিক বিচারবিশ্লেষণ পদ্ধতিটাই হল মার্কসবাদ। যেমন, মার্কস নিজে ইংল্যান্ডের গণতান্ত্রিক পরিবেশ দেখে সর্বহারা বিপ্লব গণতান্ত্রিক উপায়ে শান্তিপূর্ণ পথে হবে বলে যে সিদ্ধান্ত করেছিলেন, প্যারী কমিউনের ঘটনার পর সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মার্কস তাঁর একই বক্তব্যের ওপর নিজেই গোথা প্রোগ্রামে সংশোধনী এনেছিলেন। দু'য়ের মধ্যে সময়েরও খুব পার্থক্য ছিল না। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের আগ্রাসী রূপটা না দেখে মার্কস একরকম সিদ্ধান্ত করেছিলেন, পরে প্যারী কমিউন তাঁকে শুধরে দিয়েছে। আজও যাঁরা মার্কসের কোনও কথা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'এই কথাটা মার্কস বলেছিলেন, যা ইতিহাসে ফলেনি, ঐ কথাটা ফলেছে,' তাঁরা কি মার্কসবাদী? তাঁরা মার্কসবাদ বোঝেনইনি। লেনিন ঠিকই ধরেছিলেন যে, এগুলো মার্কসবাদ নয়, এভাবে মার্কসবাদ বোঝা যাবে না, তাকে প্রয়োগ করা যাবে না।

একইভাবে লেনিন কোথায় কী বলেছেন, তা লেনিনবাদ নয়। লেনিন যে বিজ্ঞানটিকে প্রয়োগ করলেন, যে কায়দায় যেভাবে করলেন এবং তা করতে গিয়ে আবার ঐ বিজ্ঞানকে, ঐ বিচারবিশ্লেষণ পদ্ধতিকে তিনি যতটা উন্নত করলেন এবং তার ভিত্তিতে একটা বিশেষ অবস্থায় যে মূল নীতিগুলো নির্ধারণ করলেন, সেই মূল নীতিগুলো হল মূল বুনিয়াদ, আর সেই বিচারবিশ্লেষণ পদ্ধতিটি হল লেনিনবাদ। সেটি আয়ত্ত করতে না পারলে, শুধু লেনিনের কথাগুলো মুখস্থ করে আউড়ালে কিছুই হবে না, শুধু নকলনবিশি করা হবে। তাই লেনিনের সময় পার্টি গঠন, আর আজকের সময়ে ভারতবর্ষের জমিতে পার্টি গঠনের পদ্ধতি হুবহু এক হতে পারে না — বিশেষ করে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ আজ যে রূপ নিয়ে দেখা দিচ্ছে, তা লেনিনের সময় এই রূপ নিয়ে ছিল না।

আজকের সমাজে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ঘটানোটা প্রধান সমস্যা হিসাবে দাঁড়িয়ে নেই। পুরোপুরি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে, অর্থাৎ, সামন্ততন্ত্রকে ভেঙে বুর্জোয়া ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার বিপ্লবের স্তরে, ব্যক্তি স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে ভিত্তি করে ব্যক্তিসত্তাকে উদ্দীপ্ত করাটাই প্রয়োজন হিসাবে থাকে। কিন্তু, প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া সমাজে বুর্জোয়া শাসন যেখানে কয়েক যুগ ধরে প্রতিষ্ঠিত — যেখানে বুর্জোয়ারা পিছিয়ে-পড়া বা অগ্রসর যে দৃষ্টিভঙ্গিতেই হোক এক ধরনের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান চালু করার চেষ্টা করেছে, সেই সমাজটা যেহেতু আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অংশে পরিণত হয়ে গেছে — সেহেতু সেটা যদি অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলোর তুলনায় পিছিয়ে-পড়াও হয়, তবুও সেই পিছিয়ে-পড়া বুর্জোয়া সমাজের সামাজিক ক্ষেত্রে অগ্রসর বুর্জোয়া সমাজের মতো একই লক্ষণগুলো জন্ম নেবে। এইসব পিছিয়ে-পড়া বুর্জোয়া সমাজেও ব্যক্তিবাদ আজ অগ্রসর বুর্জোয়া সমাজগুলোর মতো একটা সুবিধায় পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ, আজ ব্যক্তি তার ব্যক্তিস্বাধীনতার কথাটা যেমন করে ভাবে, বিচার করে, অধিকারটা দাবি করে — সেই অধিকারটা আজ আর লড়াই করে আদায় করার জায়গায় নেই।

বুর্জোয়া বিপ্লবের যুগে ব্যক্তিস্বাধীনতা অর্জন করার বিষয়টা ছিল — স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে, সামন্তী বাঁধনের বিরুদ্ধে, ধর্মীয় কুসংস্কার-কুআচারের বিরুদ্ধে — সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়ে কিছু অর্জন করার বিষয়। সেদিন এই ব্যক্তির অধিকারের লড়াইটা, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক নীতিনৈতিকতার ধারণার উপর সমাজপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের পরিপূরকই ছিল। তাই সামাজিক আন্দোলনে ব্যক্তিবাদ সেদিন তেমন কোনও ঝামেলার সৃষ্টি করেনি। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে, দেশাত্মবোধক আন্দোলনে, বিপ্লবী আন্দোলনে ব্যক্তিসত্তাগুলো সামনে এসে প্রবল ঝঞ্ঝাট তৈরি করেনি। কিছু কিছু হয়তো করেছে, তবুও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়ার প্রশ্নে তা সামগ্রিকভাবে বাধা ছিল

পাঁচের পাতায় দেখুন

পপুলিজম হল আমলাতান্ত্রিকতারই উল্টো রূপ

চারের পাতার পর

না, ব্যক্তি-ব্যক্তির দ্বন্দ্বের মধ্যেই ঐ ব্যক্তিবাদ মূলত সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু, একটা প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া ব্যবস্থায় যেখানে শ্রেণীসংগ্রাম তীব্র রূপ পরিগ্রহ করেছে, যেমন আমেরিকা-ইংল্যান্ড-ফ্রান্সের মতো দেশ — এইসব দেশে ব্যক্তিবাদ যে রূপ নিয়েছে, এমনকী ভারতবর্ষেও তার খানিকটা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তাতে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ আজকে এইসব দেশে একটা বিপ্লবের স্লোগান নয় — সেইমত কোনও দায়দায়িত্ব তার নেই। তা অধিকার অর্জনের হাতিয়ারের বদলে একটা সুবিধায় (privilege) অধঃপতিত হয়েছে — যাকে বলা হয় নিকৃষ্ট ধরনের ব্যক্তিবাদ। সমাজ পরিবেশে এই নোংরা ব্যক্তিবাদের প্রভাব সমাজ অভ্যন্তরে প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে কাজ করছে। এমন একটা পরিবেশ থেকে একটা দেশের কমিউনিস্ট পার্টি বা তার কর্মকাণ্ড বা আন্দোলনও বিচ্ছিন্ন নয়।

ভারতবর্ষে দিন যত এগোচ্ছে, ভারতীয় বুর্জোয়া সমাজের স্থায়িত্ব যত বাড়ছে, বুর্জোয়া সমাজের প্রতিক্রিয়ার দিক যত প্রকট হচ্ছে, ততই বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের প্রভাব সমাজের মধ্যে সুবিধাবাদের আকারে দেখা দিচ্ছে বেশি। রাশিয়ার বিপ্লব বা চীনের বিপ্লব ঠিক আজকের মত করে এই সমস্যার সম্মুখীন হয়নি, ফলে তারা তা অনুভব করেনি। চীনের বিপ্লবটাই ছিল শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব, যেখানে বুর্জোয়ারা বিপ্লবের সঙ্গে ছিল। রাশিয়ায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের একটা স্তর পর্যন্ত বুর্জোয়ারা এগিয়েছে, কমিউনিস্টদের সঙ্গে থেকেছে। তারপর বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় বসে বুর্জোয়া শ্রেণীশাসনকে স্থায়িত্ব দেওয়ার আগেই সর্বহারাশ্রেণী দ্রুত বুর্জোয়াশ্রেণীকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করেছে। এরপর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অপূরিত কাজ সমাপ্ত করেছে। এই কারণে সেখানে তখন ব্যক্তিবাদের একটা আপেক্ষিক প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল। আর, এখানে ভারতবর্ষে বুর্জোয়া শাসন দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে। এ যদি না হত, আমরা যদি '৩০ সালের মধ্যে, '৪৭ সালের মধ্যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্ব শেষ করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করে ফেলতে পারতাম, তাহলে আমাদের দীর্ঘমেয়াদী বুর্জোয়া সমাজ পরিবেশের মধ্যে প্রকট বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের ব্যাপারটাকে পার্টি গঠন করার সময় এত গুরুত্ব দিয়ে লক্ষ্য রাখবার প্রয়োজন হতো না। কিন্তু, আমাদের এই বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন হয়েছে। কারণ, ভারতবর্ষে বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থা স্বল্পকালের জন্য হয়নি, স্বল্পমেয়াদী হয়নি। এই অবস্থায় আমরা ভুলতে পারি না যে, এই বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের ব্যাপারটা লক্ষ্য রেখে না এগুলে, আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হবে। যত কষ্টকর হোক, এ জিনিস লক্ষ রেখে আমাদের এগুতে হবে, একে ঠিক জায়গায় ধরিয়ে দিতে হবে। পার্টির মধ্যে তর্কবিতর্ক, সমালোচনা-আত্মসমালোচনা, আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র সমস্ত কিছুকে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের প্রভাব থেকে রক্ষা করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তিবাদ কীভাবে কোথায় কীরূপে মাথা তোলে, কীভাবে তার দ্বারা ব্যক্তি কলুষিত হয়, দলের সর্বহারা গণতন্ত্রের পরিবেশ নষ্ট হয়, তা ধরিয়ে দিতে হবে। দেখিয়ে দিতে হবে যে, ব্যক্তিবাদ সর্বহারা গণতন্ত্রকে সুবিধায় পর্যবসিত করে। সর্বহারা গণতন্ত্র আলাদা করে কোনও ব্যক্তির সুবিধা পাওয়ার জন্য বা কোনও ব্যক্তিকে সুবিধা দেওয়ার জন্য নয় — তা সমস্ত ব্যক্তিকে নিঃস্বার্থভাবে সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে কাজ করতে শেখাবার জন্য। সমস্ত শ্রমিকশ্রেণীর সামগ্রিক আন্দোলনের স্বার্থে ব্যক্তিসত্তার প্রভাব ও আক্রমণ থেকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে মুক্ত ও রক্ষা করার জন্যই সর্বহারা গণতন্ত্র। এভাবে না বুঝলে আজকের দিনের বিপ্লবী আন্দোলনের চলবে না।

ব্যক্তিবাদের প্রভাব রাশিয়ার পার্টিতেও খানিকটা ছিল, কিন্তু আজকের বুর্জোয়া সমাজের মতো সেটা এতটা নোংরা রূপ নেয়নি। আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়েও ব্যক্তিবাদ ছিল, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের পটভূমিতে তখনও ব্যক্তিবাদ সুবিধায় পরিণত হয়নি। তখনও ব্যক্তিস্বাধীনতার স্লোগান ছিল একটা সংগ্রাম। কিন্তু, আজ তা পুরোপুরি সুবিধাবাদে পরিণত হয়েছে এবং তার প্রভাব সমাজের মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষদের উপর, যুব সম্প্রদায়ের উপর, এমনকী সমস্ত বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের উপর পর্যন্ত বর্তাচ্ছে। এ জিনিস সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে এমনভাবে বর্তমান রূপ নিয়ে ছিল না। পুঁজিবাদের আয়ু যত বাড়ছে, তত ব্যক্তিবাদ নোংরা রূপ নিচ্ছে। আরও বিশ/তিরিশ বছর বাদে একটা পুঁজিবাদী দেশে একটা কমিউনিস্ট পার্টি ব্যক্তিবাদকে আরও যেরকম নোংরাভাবে প্রকাশিত হতে দেখবে, আজ তাও দেখছে না। এই দিকটা লক্ষ্য রেখেই একটা কমিউনিস্ট পার্টিকে তার সাংগঠনিক সমস্যার কথা ভাবতে হবে। কীভাবে এই সমস্যার সে সমাধান করবে, তা ভাবতে হবে। একাজ করতে হলে লেনিনবাদের শিক্ষা থেকে এবং সেই শিক্ষাকে খানিকটা পরিবর্ধিত করে, তার প্রকৃত তাৎপর্য ঠিক বুঝে নিজের দেশে সেগুলো প্রয়োগ করতে পারা চাই। এ কাজ লেনিনের বই বা বাণীগুলো মুখস্থ করে হবে না। ওভাবে যাঁরা লেনিনবাদকে বোঝেন, তাঁরা মনে করতে পারেন, লেনিন তো এভাবে বলে যাননি; আর তা যখন বলে যাননি, তখন আমাদের এভাবে বোঝার দরকার নেই। মনে করতে পারেন, এভাবে না বুঝে যদি লেনিনের পার্টি বিপ্লব করতে পেরে থাকে, তবে ভারতবর্ষে কেন বিপ্লব হতে পারবে না? এরকম করে বিপ্লব বুঝলে, যেভাবে সি পি আই, সি পি আই (এম) নষ্ট হয়েছে, আমাদেরও তাই হবে। আমার একথার মানে আবার এরকম নয় যে, এ সম্পর্কে আমাদের কনসেপসন বা তত্ত্বটা ঠিক হওয়া নিয়েই কথা। অর্থাৎ, ওটা যখন সঠিক আছে, তখন আর আমাদের মধ্যে বেঠিক কিছু নেই, আমাদের মধ্যে দোষ নেই, ভুল নেই — আমরা যা করছি, সবই ঠিক! আমি মনে করি, এগুলো সবই আমাদের মধ্যে খুবই আছে। কিন্তু, আবার এগুলো আছে বলেই, ওই তত্ত্ব বা কনসেপসনটা ভুল হয়ে যায় না, এবং এইসব দোষত্রুটি দেখিয়ে ওই তত্ত্বটার বিরুদ্ধে লড়াই করার মানে হয় না। এই দোষগুলো দূর করবার রীতিও ওটা নয়। তার রীতিটা হল, ঐ তত্ত্বকে ঠিক ঠিকভাবে বুঝতে ও বোঝাতে সক্ষম হওয়া। তবেই আমরা দোষত্রুটি, ভুলের বিরুদ্ধে সঠিক পথে সংগ্রাম করতে পারব। তাহলেই বুঝতে পারছেন যে, ভারতের মাটিতে একটা সত্যিকারের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি গঠন করতে পারার কাজটা শুধুমাত্র এদেশের বিপ্লবের স্তরটি সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারার উপর নির্ভর করে নেই। নাহলে, লেনিনীয় পার্টি গঠনের জন্য বইয়ে কী কী নীতি ও সাংবিধানিক রীতি অনুসরণ করার কথা বলা আছে, সে-সব তো আমাদের দেশের নামডাকওয়ালা তথাকথিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলোর নেতারা ভালই জানতেন। কিন্তু, তার দ্বারা কি ঐসব পার্টিগুলো সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে গড়ে উঠতে পেরেছে? বরং নেতারা সব নিকৃষ্ট ব্যক্তিবাদের এক একজন প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এসব জিনিস শুধু বাইরের আচারআচরণ দিয়ে বোঝা যাবে না। বাইরে অনেকে খুবই বিনয়ী, ভদ্র, আপাতদৃষ্টিতে দেখলে খুবই সরল, সাধাসিধা জীবনযাপন করেন, নিজেরা জামা-কাপড় কাচেন, ঘর ঝাঁট দেন, নিজেরা অফিসের ফাইল তৈরি করেন। এভাবেই এঁরা আত্মশুদ্ধি করার চেষ্টা করেছেন, এখানেই তাঁদের বিশুদ্ধতা! কিন্তু, মনে তাঁদের পোকা ধরেছে, সেখানে সব পঙ্কিলতায় ডুবে গেছেন — হীনতা, পরশ্রীকাতরতা, ক্ষুদ্রতা, প্রতিহিংসাপরায়ণতা, হামবড়াভাব — এসব যত বদ দোষ ব্যক্তিচরিত্রের আছে, সব কিছু তাঁদের চরিত্রে ঢুকে গেছে। শুধু তাঁরা পবিত্রতা রক্ষা করেছেন হাঁটুর ওপর কাপড় পরা, আর না-খাওয়ার মধ্যে। এটা ভণ্ডামি, মার্কসবাদ নয়। আর যাঁরা সৎ তাঁদের ক্ষেত্রে এটা একধরনের মর্ষকামিতা (masochism)।

মার্কসবাদীদের, বিপ্লবী কমিউনিস্টদের আত্মশুদ্ধির রাস্তা হল, নিজেকে সমস্ত রকম নীচতা, ক্ষুদ্রতা, কূপমণ্ডুকতা, হীন স্বার্থপরতা, ব্যক্তিবাদী প্রবণতা থেকে শুরু করে জীবনের সকল বিষয়ে ব্যক্তিসম্পত্তিবোধের মানসিক জটিলতা থেকে মুক্ত করা।

এসব ফাঁকির রাস্তায় কি ব্যক্তিবাদকে দূর করা যায়? বরং, এসব রাস্তায় ব্যক্তিবাদের অহমে আরও তেল মালিশ করা হয়। মার্কসবাদীদের আত্মশুদ্ধির রাস্তা এটা নয়। আসলে সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের লক্ষ্য থেকে তাঁরা এসব আচারআচরণ করেন। দর্শন না বুঝলে এ জিনিসের প্রকৃতিই বোঝা যাবে না। এই ধরনের সস্তা জনপ্রিয় আচারআচরণ মানুষকে ঠকায় বেশি। এগুলো সেই ব্যক্তিরই দরকার হয় যে দুর্বল, জনপ্রিয়তা অর্জন করার জন্য যার কাছে এইসব পপুলিস্ট আচার-আচরণই একমাত্র সম্বল। খুঁটিয়ে বিচার করলে ধরা পড়বে যে, এগুলো আমলাতান্ত্রিকতারই উল্টো রূপ। আমলাতান্ত্রিকতা মানে কি সবসময় শাসিয়ে চাবুক উঁচু করে থাকা নাকি? মিষ্টি কথা কি ঝানু আমলারা বলে না? যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে, যাঁরা জেলে গেছেন, বা সরকারি ঝানু আমলাদের সঙ্গে কাজ করেছেন, তাঁরা দেখেছেন, আমলাদের মতন অমন চিনি আর কারোর কথায় ঝরে না। তাই বলছিলাম, এসব বাইরের সরল আচরণ, মিষ্টি কথা দিয়ে কিছু হবে না।

তার মানে আমি বিলাস, বা আরাম-আয়েসের জীবন যাপন করার কথা বলছি না। সে প্রশ্ন উঠতেই পারে না। একজন মার্কসবাদীর মানসিকতাটা হবে, তিনি বিপ্লব ও পার্টির প্রয়োজনে যেকোনও ধরনের কষ্ট হাসিমুখে ও স্বেচ্ছায় স্বীকার করতে পারেন। এ নিয়ে তাঁর মধ্যে লোককে দেখানো বা ভান করার প্রবণতা থাকবে কেন? পার্টির কোনও কর্মী বা সমর্থক যার হয়তো সামর্থ্য আছে, তিনি যদি কোনও নেতাকে ভাল জামা বা একজোড়া জুতো দেন, তবে সেই নেতা তা ব্যবহার না করে লুকিয়ে রাখবেন কেন? তিনি তা পরবেন, ব্যবহার করবেন। তাই বলে এসব জিনিসের প্রতি তিনি কখনই আসক্ত হয়ে পড়বেন না। কিন্তু, আমি দেখছি, আমাদের পার্টির নেতাদের মধ্যেও কেউ কেউ ভাল থাকা-খাওয়া-পরা এসবের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছেন, ওসব না হলে তারা দৈনন্দিন বিপ্লবী কাজকর্ম চালাতেই কষ্ট বোধ করছেন, সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন সম্পর্কে তাদের মধ্যে এক ধরনের বিরাগ সৃষ্টি হয়েছে। এগুলোও হচ্ছে ঐ বুর্জোয়া নোংরা ব্যক্তিবাদী সংস্কৃতিরই আর একটা রূপ। আমি যেটা বলতে চাইছি, তাহল, আত্মশুদ্ধির কোনও সোজা রাস্তা মার্কসবাদীরা বাতলায়নি। মার্কসবাদীদের, বিপ্লবী কমিউনিস্টদের আত্মশুদ্ধির রাস্তা হল, নিজেকে সমস্ত রকম নীচতা, ক্ষুদ্রতা, কূপমণ্ডুকতা, হীন স্বার্থপরতা, ব্যক্তিবাদী প্রবণতা থেকে শুরু করে জীবনের সকল বিষয়ে ব্যক্তিসম্পত্তিবোধের মানসিক জটিলতা থেকে মুক্ত করা।

এখন, রাশিয়ার পার্টি, চীনের পার্টি যেরূপে ব্যক্তিবাদকে পেয়েছে ও যে পদ্ধতিতে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, আমাদের দেশে আজ সেই একইরকম পদ্ধতিতে, পার্টির একইরকম সাংবিধানিক রীতি-বিধান (constitutional formalities) দিয়ে কাজ হবে নাকি? সেটা নকল করতে গেলে আমরা এগোতে পারব না, সমস্যার সঠিক সমাধানও করতে পারব না। এখানেই লেনিনবাদকে, তার মূল নীতিগুলোকে সঠিকভাবে উপলব্ধি ও আয়ত্ত করে নিজের দেশের ইতিহাস, সমাজ ও বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী তাকে প্রয়োগ করতে পারার জরুরি আবশ্যকতা।

শ্রমিকশ্রেণীর দল ও নেতৃত্বের বিষয়টিকে লেনিন পরিষ্কার করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন এবং এর অপরিহার্যতার কথা বারবার বলেছেন। তিনি একথা বলেননি যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে মানলেই একটা দল বিপ্লব করতে পারবে। উল্টে তিনি বলেছেন, সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লব হতে পারে না। এই তত্ত্ব বলতে গিয়ে তিনি যৌথ জ্ঞান, দলের নেতৃত্বের সর্বাত্মক জ্ঞানকে বুঝিয়েছেন — শুধু একটা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তত্ত্বকে বোঝাননি। কারণ, তার দ্বারা সমাজের গুরুতর সমস্যাগুলোকে সঠিকভাবে 'ট্যাকল্' করা, মোকাবিলা করা যায় না। নানা সমস্যার চরিত্র ও তার উৎপত্তির মূল জায়গাটা ঠিকমতো জানতে হলে, একটা নেতৃত্বের জ্ঞানটা সর্বাত্মক হওয়া চাই। লেনিনবাদের আর একটা মূল সিদ্ধান্ত আছে মার্কসবাদের মূল নীতিগুলোর উপলব্ধি সম্পর্কে। সেটা হচ্ছে, মার্কস-এঙ্গেলস ও লেনিন যে মূল নীতিগুলো নির্ধারণ করে দিয়ে গেছেন, সেগুলো যে যুগে যে মূল পরিস্থিতির উপর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিচারবিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে নির্ধারিত হয়েছে, সেই যুগ ও মূল পরিস্থিতিটা বিশ্বে শ্রেণী সমাবেশের দিক থেকে যতক্ষণ মূলগতভাবে এক থাকবে, ততক্ষণ সেগুলো মূলনীতি হিসাবে থাকবে। কিন্তু, এই মূল নীতিগুলোর উপলব্ধি এক জায়গায় থাকবে না। যেহেতু বাস্তব পরিস্থিতি ক্রমাগত পাল্টাচ্ছে, গুণগত পরিবর্তন ঘটতে সময় লাগলেও পরিমাণগত পরিবর্তন প্রতিনিয়তই ঘটতে থাকে, সেহেতু তাকে প্রয়োগ করতে গেলেই একটা পার্থক্য ও দ্বন্দ্ব দেখা দেবে। এই সত্যটা সাধারণ মানুষের বোঝার জন্য তিনি খুব সুন্দর রাজনৈতিক পরিভাষায় একটা কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, যেকোন মূল নীতিকে যখনই একটা বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে যাওয়া হবে, তখনই একটা দ্বন্দ্ব দেখা দেবে। এই দ্বন্দ্বটা হচ্ছে সাধারণের (general) সঙ্গে বিশেষের (particular) দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ, মূল নীতিগুলোর সাধারণ উপলব্ধি ও তার বিশেষ প্রয়োগ — এই দুয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব। এর অর্থ হচ্ছে, বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গেলেই মূল নীতিগুলোর উপলব্ধি আর আগের জায়গায় থাকে না — তা বিকশিত হয়, সম্প্রসারিত হয়, প্রয়োজনে তা সংশোধিত (amended) হয় — তার ক্যাটিগরিটা পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও উন্নত হতে

ছয়ের পাতায় দেখুন

কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে জনমতের প্রতিফলন ঘটেনি

যদি কেউ বলে, কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের ধূলিকণা এখনও থিতিয়ে যায়নি, তাহলে এটা শুধু একটা ভাষার আলংকারিক প্রকাশই হবে না, এটা ঘটনাও। বাস্তবে এই ধূলি হল, বেলারির লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ আকরিকের ধূলি — যা কর্ণাটক বিধানসভার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এই খনিমালিকরাই নির্বাচনে পর্দার আড়াল থেকে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেছে। নির্বাচনের ফলাফল কী হবে সেটা নির্ধারণই শুধু নয়, নির্বাচনের পরে সরকার গঠনের ক্ষেত্রে এম এল এ কেনাবেচা, মন্ত্রীত্বের পদ বিতরণ সহ নানা ক্ষেত্রে এই খনিমালিকরা প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়েছে। এই নির্বাচনের আরেকটি কলঙ্কজনক দিক হল, আচরণবিধির নামে নির্বাচন কমিশনের চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ।

তাড়াহুড়োর নির্বাচন

নির্বাচন কমিশন যেভাবে নির্বাচন পরিচালনা করেছে, তাকে একটা ষড়যন্ত্র বললেও কম বলা হয়। নির্বাচন কমিশন ঠিক করেছিল, প্রথমেই যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে এমন বিধানসভা ক্ষেত্রের সীমানা নতুন করে নির্ধারণ করা হবে। কিন্তু যে নতুন বিধানসভা কেন্দ্রগুলি তৈরি হল, তার পিছনে কী যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে, বা এই কাজে কমিশন কেন এত তৎপর হয়ে উঠেছে, তা বলা হল না। সীমানা নির্ধারণের কাজ শেষ করতে রাজ্যের রাষ্ট্রপতি শাসনের সময়সীমা আরও ছয় মাস বাড়ানো দরকার মনে করে, ইলেকশন এখনই হচ্ছে না ধরে নিয়ে সকলেরই যখন একটা গা-ছাড়া ভাব, তখন নির্বাচন কমিশন হঠাৎ নির্বাচন ঘোষণা করে বলে, সীমানা নির্ধারণ এবং বিধানসভা নির্বাচন মে মাসের মধ্যেই হবে। বাস্তবে এটাই ছিল বিজেপি-র দাবি। অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক দল যখন চাইছিল নির্বাচনের যথাযথ প্রস্তুতি এবং রাষ্ট্রপতি শাসনের সময়সীমা বৃদ্ধি করা, তখন বিজেপি তড়িঘড়ি নির্বাচনের দাবি জানায়। নির্বাচন কমিশনের অস্বাভাবিক তাড়াহুড়োর ফল কী — আজ তা সকলের কাছেই পরিষ্কার। যথাযথ ভাবে সীমানা নির্ধারণ না হওয়া, পুরনো ভোটার লিস্টের ভিত্তিতে নির্বাচন পরিচালনা করা, লাখ লাখ ভোটারদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা — সবই হয়েছে এই নির্বাচনে। এই তাড়াহুড়োর জন্য ছাত্রদের পরীক্ষার সময়সূচি পাল্টাতে হল, স্কুলে পাঠ্যবই এবং অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার ছাপা বিঘ্নিত হল, চাষিদের সার-বীজ দেওয়ার কাজে বিঘ্ন ঘটল। এই তাড়াহুড়োর দ্বারা কে লাভবান হল, তা আজ সকলের কাছেই পরিষ্কার। নির্বাচন কমিশন এর পর যা করল, তা আরও ভয়ঙ্কর। নির্বাচন কমিশন প্রতিদিন প্রায় ঘন্টায় ঘন্টায় নানা নির্দেশিকা জারি করে প্রার্থীর পক্ষে প্রচার করার সামান্য হলেও যতটুকু সুযোগ ছিল, সেটাও সঙ্কুচিত করে দিল। জনসভা প্রায় নিষিদ্ধ করা হল। নানা ছুতোয় গাড়ি ব্যবহারের অনুমতি দিতে অস্বীকার করা হল। মিছিল, পদযাত্রা করার অনুমতিও দেওয়া হয়নি। দেওয়াল লিখন ও পোস্টারিং করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও বহু ক্ষেত্রে বাড়ি বাড়ি প্রচার ও লিফলেট বিলিতেও বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। বৃহৎ বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া দলগুলি নির্বাচন কমিশনের এই ধরনের নির্দেশের কোনও প্রতিবাদ পর্যন্ত করেনি। কারণ, প্রচুর অর্থ ব্যয় করে প্রচার করার ও ব্যয়বহুল প্রচারমাধ্যম ব্যবহারের ক্ষমতা তারা রাখে। তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে তা ব্যবহারও করেছে। কিন্তু এস ইউ সি আই-এর মতো দল, যে বিপ্লবী উদ্দেশ্যমুখিনতা নিয়ে জনগণের স্বার্থ তুলে ধরতে চেয়েছে, বা যারা নির্দল প্রার্থী, তারা এই বিধিনিষেধের সম্মুখীন হয়েছে। আমাদের দলের রাজনৈতিক লাইন ও দৃষ্টিভঙ্গি জনগণের সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রচলিত উপায়গুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রচার করা দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। একেকটি কেন্দ্রের সকল ভোটারদের কাছে আমাদের প্রার্থীর পরিচিতি পর্যন্ত জানানো যায়নি। বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যম শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের কোনও প্রচারই দেয়নি। বৈদ্যুতিন প্রচারমাধ্যমে এবং দৈনিক সংবাদপত্রে ধারাবাহিক প্রচারের মধ্য দিয়ে প্রধান বুর্জোয়া দলগুলিকে সামনে নিয়ে আসা হয় এবং এভাবে শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থে জাতীয় স্তরের মতো রাজ্যস্তরেও দুই দল, বা দুই জোটের মধ্যে জনমতকে ভাগ করে দেওয়া হয়।

সংবাদমাধ্যম কংগ্রেস, বিজেপি এবং জনতা দল (সেক্যুলার)— এই তিনটি দলের পক্ষে ব্যাপক প্রচার চালায়। নির্বাচন কমিশন তিনটি পর্যায়ে নির্বাচন করেছে কেন, তা আজ স্পষ্ট। সংবাদমাধ্যমের যে অংশ বিজেপি-র পক্ষে ব্যাপক প্রচারে নেমেছিল, তারা পুরোপুরি তিনটি পর্যায়ে নির্বাচনের সুযোগকে ব্যবহার করেছে। এই ভাড়াটে সংবাদমাধ্যমের একটি অংশ বুথ ফেরত সমীক্ষার নামে দেখাতে থাকে, বিজেপি-ই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছে। অপর অংশ সমীক্ষার তথ্য প্রচারের মধ্য দিয়ে দোদুল্যমান ভোটারদের পক্ষে আনার প্রতারণাময় পথ গ্রহণ করে। প্রথম পর্যায়ে নির্বাচনের পর প্রচার করা হয় যে, বিজেপি অন্যদের থেকে এগিয়ে আছে। এই প্রচার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে ভোটারদের বিজেপি-র পক্ষে ভোট দিতে চালিত করে। এইভাবে সংবাদমাধ্যমগুলি অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করে। নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হতে দেখা যায়, বিজেপি প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনে ভাল ফল করেনি। কিন্তু বিজেপি-র পক্ষে সংবাদমাধ্যমের ধারাবাহিক প্রচার পরবর্তী পর্যায়ে নির্বাচনী ফলাফলকে বিজেপি-র পক্ষে সাহায্য করে।

ঢালাও উৎকোচ ও টাকার বন্যা

বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া দলগুলি ভোটারদের প্রলোভিত করতে কে কার চেয়ে কত বেশি টাকা এবং নানারকম দ্রব্যসামগ্রী দিতে পারে, তার প্রতিযোগিতায় নামে। ভোটার পিছু ৩ হাজার টাকা, নানা রঙের নাকের রিং, কানের দুল, শাড়ি, ধুতি, টিভি সেট, তিন মাসের কেবল টিভির বিল, রান্নার গ্যাসের পারমিট ইত্যাদি ব্যাপকভাবে বিলি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে বিজেপি অন্যদের চেয়ে কয়েক ধাপ এগিয়েছিল। উত্তর কর্ণাটকের খনিমালিকরা এবং দক্ষিণ কর্ণাটকের জমি ব্যবসায়ীরা এই কাজে দেদার টাকা যুগিয়ে গেছে। জনতা দল (এস) এবং বিজেপি-র মধ্যে ৬ মাস অন্তর মুখ্যমন্ত্রী পদ ভাগাভাগি করে চলার যে চুক্তি হয়েছিল, জনতা দল (এস) তা ভঙ্গ করায় বিশ্বাসভঙ্গের জন্য বিজেপি-র মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ইয়েদুরাপ্পার প্রতি তথাকথিত সহানুভূতির হাওয়া কোথাও দেখা যায়নি।

ফলাফল

উপরোক্ত অপকর্মগুলি পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে বিজেপি একক বৃহত্তম দল হিসাবে কিছুটা এগিয়ে গেলেও ২২৪ আসনবিশিষ্ট কর্ণাটক বিধানসভায় সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় গরিষ্ঠতা পায়নি। বিজেপি পেয়েছে ১১০টি আসন, যা সরকার গঠনের প্রয়োজনীয় গরিষ্ঠতা থেকে তিনটি কম। কংগ্রেস পেয়েছে ৮০টি এবং জেডিএস পেয়েছে ২৪টি আসন। এছাড়া নির্দলরা পেয়েছে ৬টি আসন। এই অবস্থায় প্রয়োজনীয় সংখ্যা জোগাড় করার জন্য ৬ জন নির্দল — যার মধ্যে ৪ জন কংগ্রেসেরই বিক্ষুব্ধ — তাদের ধরার জন্য জাল বিস্তার করে। এর জন্যও যে মোটা টাকার প্রয়োজন, তা জুগিয়েছে খনিমালিকরা। এই নির্দলদের গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয়েছে। এইভাবে বিজেপি সরকার গঠন করেছে। সরকার গঠনের অব্যবহিত পরেই বিজেপি-র স্বরূপ ফুটে উঠেছে। যে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিজেপি কৃষক-স্বার্থ রক্ষার নামে শপথ নেয়, সেই মুখ্যমন্ত্রীই সারের দাবিতে কৃষকদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে গুলি চালায় এবং তাতে দু'জন নিরীহ কৃষক প্রাণ হারায়।

সিপিএম, সিপিআই-এর ভূমিকা সম্পর্কে যত কম বলা যায়, ততই ভাল। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সারা দেশের মতো কর্ণাটকেও এরা গণআন্দোলনের পতাকাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এবার সিপিআই, আর পি আই, কিছু দলিত ও চাষি সংগঠনের সঙ্গে সমঝোতা করে ৯টি আসনে লড়েছে। আর সিপিএম একাই লড়েছে ৯টি আসনে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। সিপিএম কোলার জেলার বাগেপল্লি আসনটি ধরে রাখতে কংগ্রেসের সঙ্গে গোপনে বোঝাপড়া করেছে, কিন্তু কার্যত তা কোনও কাজে লাগেনি। কংগ্রেসের কাছে তারা এই আসনটি হারিয়েছে। বিএসপি, এস পি এবং জনতা দল (সেক্যুলার)-এর মতো দলগুলির ফলাফল শোচনীয়।

নির্বাচনের এই পর্যায়ে জনসাধারণ একটা অসহায় দিকভ্রান্ত অবস্থায় পড়ে গিয়েছিল। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বাণিজ্যিকীকরণ, কৃষকদের দুঃসহ অবস্থা, নিম্নবিত্তদের জীবনযাত্রার মান নিম্নগামী হওয়া — সব মিলিয়ে মানুষের বিক্ষোভ ফুটছিল। কৃষকদের বিক্ষোভের আগুন সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু, উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে তা সঠিক পরিণতির দিকে যেতে পারল না।

এস ইউ সি আই এই নির্বাচনে ৭টি জেলায় ১২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। নির্বাচন কমিশনের কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যেও বিভিন্ন সভা, লিফলেট প্রভৃতির মধ্য দিয়ে দলের রাজনৈতিক লাইন ও নির্বাচন সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি যতটুকু প্রচার করা গেছে, জনসাধারণের মধ্যে তা আকর্ষণ তৈরি করেছে। একে সংহত করার মধ্য দিয়ে পার্টি সংগঠন বিস্তারের সুবর্ণ সুযোগ দলের সামনে উন্মুক্ত হয়েছে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রকৃত উপলব্ধি

পাঁচের পাতার পর

থাকে। এজন্যই বিশেষ অবস্থার বিশেষ বিশ্লেষণের উপর, অর্থাৎ 'অবজেক্ট'-এর উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তা না হলে বিপ্লবের গোটা ব্যাপারটাই দাঁড়িয়ে যায় 'সাবজেক্টিভ' (বাস্তববিবর্জিত অলীক কল্পনা।

এখন, লেনিনের এই সিদ্ধান্তটা জানা থাকলেই কি কোনও নেতৃত্ব তার সঠিক প্রয়োগ ঘটাতে পারবেন? লেনিন দেখিয়েছেন, পুঁজিবাদের অসম বিকাশের জন্য প্রতিটি দেশের বিকাশের ঘটনা আলাদা, বৈশিষ্ট্যও আলাদা। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই মার্কসবাদের মূল নীতিগুলোর প্রয়োগও ব্রিটেনে যেভাবে হবে, তেমনভাবে ফ্রান্সে হবে না, আবার জার্মানিতে ও রাশিয়াতে তার প্রয়োগ আলাদা আলাদা হবে। লেনিনের এই কথাটা ধরুন কোনও মানুষ রাজনৈতিকভাবে বুঝলেন এবং একেবারে কণ্ঠস্থ করে ফেললেন। কিন্তু, তাতে প্রমাণ হয়না যে, তিনি সেটা উপলব্ধি করেছেন এবং সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারেন। আমাদের মধ্যেও অনেকেই লেনিনের এই তত্ত্বটার কথা বলেন, কিন্তু, বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে পার্থক্যটা খেয়ালে রাখতে পারেন না। এটা খেয়ালে রাখা তখনই সম্ভব, যখন যে মূল মার্কসবাদী বিচারবিশ্লেষণ পদ্ধতি, চিন্তাপ্রক্রিয়াকে ভিত্তি করে লেনিন এই তত্ত্ব নির্ধারণ করেছেন, সেটা কেউ আয়ত্ত করতে পেরেছেন। একমাত্র তখনই তিনি এই তত্ত্বের মর্মবস্তুটা উপলব্ধি করতে পারবেন। আর, এটা করতে পারলেই, সেটা বিশেষ অবস্থায় প্রয়োগ করতে গেলে কী বিশেষ দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে, কী পার্থক্য ঘটছে, তাও তিনি ধরতে পারবেন। আবার, এই পার্থক্যের জন্য লেনিনীয় মূল নীতিগুলো পাল্টে যায় না। যতক্ষণ এগুলো মূল নীতি হিসাবে আছে, ততক্ষণ অবস্থা নির্বিশেষে তার প্রয়োগের তারতম্য হলেও মূল নীতিতে এক থাকবে। কিন্তু, মূলগতভাবে এক থাকলেও details-এ (বিশদ ব্যাখ্যায়) এক থাকবে না। তাই কীভাবে মূলগতভাবে এক আছে, কিভাবে বিশদ ব্যাখ্যায় এক নেই, তা সম্প্রসারিত হয়ে গেছে, পরিবর্ধিত ও উন্নত হয়েছে, কোথায় কোন বিষয়টার উপর দেশ ও পরিস্থিতি বুঝে জোর দিতে হবে — এগুলো বোঝাই মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সঠিকভাবে বোঝা।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

কুৎসিত ক্ষমতালিপ্সা

একের পাতার পর

প্রকাশ্যে হচ্ছে। এমনকী ক্রিকেট জুয়ার মতো আস্থা ভোট নিয়েও জুয়া বা বেটিং-এ কত কোটি টাকার বাজি ধরা চলছে তাও গোপন নেই। কিন্তু আইনের শাসনের এমনই মহিমা যে এদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া তো দূরের কথা, তেমন কোনও ইঙ্গিতের কথাও কেউ উচ্চারণ করছে না। অথচ দেশে ন্যূনতম গণতন্ত্র থাকলে বাজারের আলু-পটলের মতো বিক্রয়যোগ্য এই সব রাজনীতিকদের সাংসদপদ এখনই বাতিল করে দিয়ে, নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া নিষিদ্ধ করা উচিত ছিল। কিন্তু এরাই আবার আগামী নির্বাচনে এসে জনস্বার্থের কথা বলে গলা ফাটাবেন, পুঁজিপতি ও কালোবাজারিদের অঢেল টাকা নিয়ে নির্বাচনে ঢালবেন, মাফিয়া দিয়ে ভোট করাবেন এবং জিতবেন। এরপরও যথারীতি ভারতীয় সংসদীয় ব্যবস্থার মহিমা নিয়ে পাতার পর পাতা লেখা হবে। এ কথা মনে করা ভুল যে, দায়ী কেবল তাঁরাই, যাঁরা বিক্রি হচ্ছেন; যাঁরা তাঁদের কিনছেন, আড়ালে থেকে কেনার জন্য দালাল পাঠাচ্ছেন, টাকার থলি জোগাচ্ছেন, বড় ক্রিমিনাল তো তাঁরাই। মনমোহন সিং, সোনিয়া গান্ধী, প্রকাশ কারাতদের সাধু সেজে জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার দিন শেষ। এম পি কেনাবেচার রাজনীতিতে তাঁরাই যে নাটের গুরু, এ কথা বোঝা এখন আর মোটেই কঠিন নয়।

আস্থা ভোটে ইউ পি এ সরকার জিতল কি হারল, সরকার থাকল কি গেল, দেশের জনগণ জানে, এর দ্বারা তাদের জীবনে মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারির সংকটের কোনও সুরাহা হবে না। কিন্তু এটুকু বুঝলেই এই দুষ্ট রাজনীতির নাগপাশ থেকে মুক্তি মিলবে না। সংসদীয় গণতন্ত্রের নামে আমাদের দেশে যে পুঁজিতন্ত্র চলছে, তাকে চুরমার করতে না পারলে, এবং যথার্থ জনগণের জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে যে শোষিত মানুষের মুক্তি নেই, এই মূল সত্যটাই সকলের গভীরভাবে উপলব্ধি করা দরকার।

২০ আগস্ট

দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক স্পনসরিং কমিটির

ট্রেড ইউনিয়নগুলির স্পনসরিং কমিটির ডাকে ২০ আগস্ট সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে ১৫ জুলাই শ্রমিক-কর্মচারীদের এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে রাজ্যের বিভিন্ন ইউনিয়নের দেড় সহস্রাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। কলকাতা ও শহরতলির বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল থেকে আগত হিন্দিভাষী শ্রমিক ও নারীশ্রমিকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। হলে সকলের জায়গা না হওয়ায় অনেকে বাইরে দাঁড়িয়েই বক্তব্য শোনেন। কনভেনশনের মূল বক্তা অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেন, বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদ তীব্র বাজারসংকটে ভুগছে। উদ্বৃত্ত পুঁজি এই সংকটকে করতে বাধ্য করা হচ্ছে। আমাদের দেশে শ্রমআইন রক্ষা ও প্রয়োগের ৮০ ভাগ দায় রাজ্য সরকারগুলির। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে স্পনসরিং কমিটি অফ ট্রেড ইউনিয়নস ১৩ মে দিল্লিতে সর্বভারতীয় সম্মেলনে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির দেশি-বিদেশি পুঁজির শ্রমস্বার্থবিরোধী নীতির প্রতিবাদে এক ঘোষণাপত্র গ্রহণ ও আগামী ২০ আগস্ট সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘট পালনের আহ্বান করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের সরকারি দলের আজ্ঞাবাহী কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি রাজ্য সরকারের শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী নীতিকে আড়াল করার উদ্দেশ্যে দিল্লিতে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ঘোষণাপত্র পরিবর্তন করে এবং শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী কার্যক্রমের জন্য শুধুমাত্র কেন্দ্র ও অ-বাম শাসিত রাজ্যগুলিকে

১৫ জুলাই শ্রমিক কর্মচারী কনভেনশনে বক্তব্য রাখছেন কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী। পাশে যথাক্রমে এ এল গুপ্তা ও দিলীপ ভট্টাচার্য।

আরও তীব্র করেছে। দেশি-বিদেশি পুঁজির সর্বগ্রাসী আক্রমণে সাধারণ মানুষ দিশেহারা। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ও জ্বালানির অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি জনজীবনকে অসহনীয় করে তুলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার গণবণ্টন ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে খুচরো ব্যবসায় দেশি-বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে চলেছে। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলিও জনস্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব পালন করছে না। কেন্দ্র ও বাম-ডান শাসিত রাজ্য সরকারগুলি ব্যাপক হারে কর্মী ও কর্ম সংকোচন করছে। ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ করে ন্যূনতম মজুরি এবং পি এফ-এর সুবিধা থেকে শ্রমিকদের বঞ্চিত করছে। সরকারি, বেসরকারি সকল ক্ষেত্রেই ঠিকা শ্রমিকদের ১০-১২ ঘণ্টা কাজ চিহ্নিত করেছে। এই দ্বিচারিতাকে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী শ্রমিক আন্দোলনে মতবাদিক সংগ্রাম গড়ে তুলে আন্দোলনের শক্তিকে সংহত করার এবং আগামী ২০ আগস্ট দিনটিকে অঘোষিত ছুটির দিন হিসাবে পালন করার সর্বনাশা মনোভাবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আগামী দিনে প্রয়োজনে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার পাদপীঠ হিসাবে এই সাধারণ ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানান। সভা পরিচালনা করেন অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সভাপতি কমরেড অনন্তলাল গুপ্তা, বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

আলুচাষির এই দুর্দশা কেন

একের পাতার পর

আলু ওঠার সময়ে সরকার বেনফেডকে দিয়ে যে পরিমাণ আলু কিনেছে, তা নামমাত্র। আজ যখন সমস্যা চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছে, তখন সরকার হঠাৎ তৎপর হয়ে উঠে বলছে, যারা আলু বাইরে পাঠাতে পারবে, তাদের জন্য ভরতুকি দেওয়া হবে। তাদের এই তৎপরতা অগে দেখা যায়নি কেন? এ বছর ছোট চাষিরাও দাম না পেয়ে আলু হিমঘরে রাখতে বাধ্য হয়েছে। তাদের পক্ষে কি আলু বাইরে পাঠানোর ব্যবস্থা করা সম্ভব? অর্থাৎ ভরতুকির সুফলটুকু অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এ ক্ষেত্রেও পাবে সেই বড় চাষি এবং ব্যবসায়ীরাই। ফলে জীবন-জীবিকার দায়ে রাজ্যজুড়ে আলুচাষিরা তুমুল বিক্ষোভে সামিল হচ্ছেন। দাবি তুলেছেন, সরকারকে লাভজনক দামে চাষিদের কাছ থেকে আলু কিনতে হবে, বীজ এবং ন্যায্য মূল্যে সার সরবরাহের দায়িত্ব নিতে হবে, সরকারি ও বেসরকারি সমস্ত কৃষিঋণ মকুবের দায়িত্ব নিতে হবে, হিমঘর ভাড়ার উপর ভরতুকি দিতে হবে ইত্যাদি।

সর্বত্র আজ এ প্রশ্ন উঠছে যে, রাজ্যে যে শিল্পায়নের জন্য মুখ্যমন্ত্রী সহ সিপিএম নেতাদের রাতের ঘুম চলে গেছে, তা টাটা-জিন্দাল-সালিমদের ইস্পাত এবং কেমিকেল হাবেই সীমাবদ্ধ কেন? কৃষকদের বাঁচাতে কেন এত বছরেও সরকারি উদ্যোগে কৃষিভিত্তিক কোনও শিল্প গড়ে উঠল না, খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে উঠল না?

যে সার-সেচ-বীজ-কীটনাশকের চড়া দামের জন্য কৃষকদের উৎপাদন খরচ বেড়ে গিয়ে শেষপর্যন্ত লোকসানের মাত্রাকেই বাড়িয়ে তুলছে, সেগুলির দাম কমানোর জন্য সরকার কী চেষ্টা করেছে? প্রথমত, সারের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির জন্য যে ভরতুকি তুলে নেওয়াকে সিপিএম নেতারাও দায়ী করেন, তার বিরুদ্ধে তাঁরা কৃষকদের সংগঠিত করে যেমন কোনও আন্দোলন গড়ে তোলেননি, তেমনই সার নিয়ে রাজ্যজুড়ে যে ব্যাপক কালোবাজারি চলছে তার বিরুদ্ধে সরকার কোনও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়নি। ফলে চাষিদের নির্ধারিত দামের থেকে অনেক বেশি দাম দিয়ে সার কিনতে হচ্ছে। সারের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে অসাধু ব্যবসায়ীরা চাষিদের রাসায়নিক সারের সাথে অনুখাদ্য প্রভৃতি অপ্রয়োজনীয় সার কেনা বাধ্যতামূলক করছে। এ ক্ষেত্রেও প্রশাসন ঠুঁটো জগন্নাথ। বরং এই অসাধু ব্যবসায়ীদের পিছনে শাসকদলের স্থানীয় নেতাদের মদত রয়েছে।

আলুর বীজের জন্য আজও চাষিদের অন্য রাজ্যের দিকে চেয়ে থাকতে হয়, কিনতে হয় অত্যন্ত উচ্চমূল্য দিয়ে। এ রাজ্যে বীজ উৎপাদনের জন্য সরকার কোনও চেষ্টা করেনি। কোনও আলু গবেষণাকেন্দ্র এ রাজ্যে নেই। রোগ নির্ণয় থেকে বীজ আমদানি— সবকিছুর জন্য অন্য রাজ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। আলুর গবেষণা ও বীজ উৎপাদনের জন্য দার্জিলিঙের পাহাড়ি এলাকাকে কাজে লাগানো যেত। মুনাফাবাজ বেসরকারি কোম্পানিগুলির হাতে ছেড়ে না দিয়ে অন্যান্য শীতপ্রধান ও পাহাড়ি এলাকাযুক্ত রাজ্যের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে এ রাজ্যের চাষিদের জন্য আলুর বীজ আনার ব্যবস্থা সরকার নিজে করতে পারত। এ রাজ্যেও বৈজ্ঞানিক প্রথায় আলুবীজ উৎপাদনের জন্য চাষিদের কারিগরি সহায়তা দিতে পারত। এ সব কিছুই করেনি সরকার। শুধু বক্তৃতায় 'আমরা কৃষিতে চ্যাম্পিয়ন' বলে ঘোষণা করে গলা ফাটিয়েছে।

ধান, পাট, সব্জি, ডাল প্রভৃতি প্রায় প্রতিটি ফসলের জন্যও উন্নতমানের গবেষণাগার এ রাজ্যে আছে; সেগুলিতে কর্মী-অফিসার এবং গবেষকরা আজও বেতন পেয়ে চলেছেন, অথচ কোথাও কোনও গবেষণা হয় না বললেই চলে। উন্নত মানের ধান গবেষণাগার আছে হুগলির চুঁচুড়াতে। তার বিপুল পরিমাণ জমি আজ খাঁ খাঁ করছে।এছাড়াও নদীয়ার কৃষ্ণনগরে ফল ও শাকসব্জি গবেষণাকেন্দ্র, বেথুয়াডহরীতে আখ গবেষণাকেন্দ্র, বহরমপুরে ডাল ও তৈলবীজ গবেষণাকেন্দ্র, জলপাইগুড়ির মোহিতনগরে আনারস গবেষণাকেন্দ্র রয়েছে। সরকারি অবহেলায় সবগুলিই প্রায় ধুঁকছে। সম্প্রতি এগুলির সবই বেসরকারি মালিকদের কাছে বিক্রি করে দেওয়ার উদ্যোগ চলছে। রাজ্যে রয়েছে দু'টি পূর্ণাঙ্গ কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়। সরকারি অপদার্থতা, দলবাজি এবং গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে সেগুলিরও কার্যকারিতা নষ্ট হতে বসেছে।

বাস্তবে কৃষক-শ্রমিক সহ সাধারণ মানুষের স্বার্থকে আজ তাঁরা দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থের কাছে বলি দিয়েছেন। বন্ধ কারখানার অনাহারক্লিষ্ট শ্রমিক সপরিবারে আত্মহত্যা করলে, ফসলের দাম না পেয়ে ঋণজর্জর কৃষক আত্মহত্যা করলে আজ আর তাঁদের কিছু যায় আসে না। তাঁরা আজ মালিকশ্রেণীর আশীর্বাদপুষ্ট। শিল্প করার নামে তাই পুঁজিপতিদের জমি-জল-বিদ্যুৎ-ট্যাক্সে অকাতরে ছাড় দিয়ে যাচ্ছেন, অথচ কৃষকদের সার-বীজ-কীটনাশকের জন্য কোনও ভরতুকি নেই। কৃষিকে চরম অবহেলায় ফেলে রেখেছেন মধ্যযুগে, আর দেশের কৃষক-শ্রমিক-সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে কৃষিভিত্তির গল্প শোনাচ্ছেন। সত্যিই সরকার কৃষিকে ভিত্তি মনে করলে, কৃষকদের এই চরম দুরবস্থার মধ্যে পড়তে হত না।

ফলে চরম কৃষকস্বার্থবিরোধী তথা জনস্বার্থ বিরোধী এই সরকারের টনক নড়াতে হলে ফসলের ন্যায্য দামের দাবিতে এবং সার-বীজ-বিদ্যুৎ-কীটনাশকের দামে ভরতুকির দাবিতে ব্যাপক চাষি আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া চাষির বাঁচার অন্য কোনও উপায় নেই। এর জন্য প্রয়োজন রাজ্যজুড়ে সর্বত্র কৃষক সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোলা এবং সেই কমিটির নেতৃত্বে কৃষকদের দাবি নিয়ে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা।

স্থায়ীকরণের দাবিতে রি-লাইনিং ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের গণকনভেনশন

ওরা ইস্কো বার্নপুর কারখানার কেউ হেল্পার, কেউ ফিটার, কেউ রিগারদক্ষ, কেউ কেউ ২০ বছরের অভিজ্ঞ শ্রমিক। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ওদেরকে স্থায়ীকরণ করছে না। ওরা রি-লাইনিং শ্রমিক।

ইস্কোতে ইতিপূর্বে যখনই রি-লাইনিং-এর কাজ হয়েছে, তখনই এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছে এবং কমপক্ষে তিন বার রি-লাইনিংয়ে কাজ করার পর সেই শ্রমিককে ইস্কো কর্তৃপক্ষ স্থায়ী চাকরি দিয়েছে। শুধু ইস্কোতেই নয়, 'সেল' (SAIL) অধিগ্রহণ করার পরও দুর্গাপুর রি-লাইনিং ওয়ার্কারদের ডিএস পিতে স্থায়ীকরণ করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য 'সেল' অধিগৃহীত স্টিল প্ল্যান্টেও এইরকম শ্রমিকদের স্থায়ীকরণ করা হয়েছে। রি-লাইনিং শ্রমিকদের এভাবে স্থায়ীকরণের রীতি থাকা সত্ত্বেও বার্নপুর কর্তৃপক্ষ কয়েকশ' শ্রমিককে স্থায়ীকরণ করছে না। এই শ্রমিকরা ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে বার্নপুর কারখানার ব্লাস্ট-ফার্নেসে কেউ সাতবার, কেউ আটবার, কেউ দশবার কাজ করা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ তাদের স্থায়ীকরণ করছে না। এই বঞ্চনার প্রতিবাদে রি-লাইনিং ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

দীর্ঘদিন রি-লাইনিং-এর কাজ বন্ধ থাকার পর বার্নপুরে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি আবার কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এই দক্ষ শ্রমিকদের বঞ্চিত করে বেআইনিভাবে কাজ আউটসোর্সিং করছে, অর্থাৎ বাইরের কন্ট্রাক্টরদের দিয়ে করাচ্ছে। তখন থেকে শ্রমিকরা প্রশাসনের স্তরে স্তরে দাবি জানালেও কোনও সুবিচার মেলেনি। এই অবস্থায় আন্দোলনকে আরও তীব্র করতে ৩০ জুন বার্নপুর টানেল গেট রোডে এক গণকনভেনশনের ডাক দেওয়া হয়।

কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিশ্বনাথ ব্যানার্জী। সভা পরিচালনা করেন ইস্কো এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সম্পাদক সঞ্জয় চ্যাটার্জী। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন অসিত দাস। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন অশোক ভট্টাচার্য, দুর্গাপুর স্টিল ওয়ার্কার্স কো-অর্ডিনেশন ইউনিয়নের পক্ষে সব্যসাচী গোস্বামী, হিন্দুস্তান কেব্‌ল মেনস্ ইউনিয়নের পক্ষে দীপেন সোম প্রমুখ। কনভেনশনে অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষে কমরেড বাবলা ভট্টাচার্য বলেন, পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের নীতি অনুসরণের ফলেই শ্রমিকজীবনে এই ধরনের সমস্যা নেমে আসছে। তিনি এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে শুধু পাশে থাকাই নয়, কার্যকরীভাবে সাহায্য করার অঙ্গীকার করেন। কনভেনশনে এ আই টি ইউ সি, এইচ এম এস প্রভৃতি সংগঠনও উপস্থিত ছিল।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

লড়াইয়ের প্রয়োজনেই আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি, নিছক ভোটের স্বার্থে নয়

২১ জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের সভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

২১ জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের শহীদ স্মরণ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত ধর্মতলার সমাবেশে তৃণমূল নেতৃত্ব এস ইউ সি আই-কে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌমেন বসু এবং রাজ্য কমিটির দুই সদস্য কমরেড তপন রায়চৌধুরী ও কমরেড স্বপন ঘোষ।

সমাবেশে তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জী বলেন, আমরা এক সময়ে কংগ্রেস করতাম। কিন্তু কংগ্রেস যখন সিপিএমের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বদলে তাদের সাথে ভাব করল, আমরা কংগ্রেস ছাড়লাম। আজও কখনও সিপিএমের সাথে ভাব, কখনও ঝগড়ার যে রাজনীতি কংগ্রেস করছে, আমরা তা করব না। আমরা সরাসরি সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের রাজনীতি করব। যাঁরাই এই লড়াই চান, আসুন আমরা একসঙ্গে কাজ করি। তিনি বলেন, বহু পঞ্চায়েতে আমরা জয়ী হয়েছি, জেলা পরিষদ পেয়েছি, সর্বত্র ভাল কাজ করতে হবে যাতে মানুষ আমাদের প্রশংসা করে। আন্দোলনের যে ধারা সৃষ্টি হয়েছে, তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। চাষিরা ফসলের দাম পাচ্ছে না, আলুচাষিদের অবস্থা করুণ, জিনিসপত্রের দাম আগুন। কিন্তু কেন্দ্র বা রাজ্য কারোরই তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। আমরা এর বিরুদ্ধে লড়াই করব। সিঙ্গুরের নিহত মানুষ বিচার পায়নি, নন্দীগ্রামের নিহত মানুষ বিচার পায়নি। এ জন্যও আমরা লড়াই করব। সিঙ্গুরের চাষিদের জমি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা লড়াই চালাব। আমরা আরও মানুষের কাছে যাব।

পরিশেষে তিনি বলেন, আমরা দিল্লির দিকে তাকিয়ে নেই। দিল্লিতে আস্থা ভোটে আমরা কংগ্রেসের পক্ষেও ভোট দেব না, সিপিএম-বিজেপি-র পক্ষেও ভোট দেব না।

প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী কবীর সুমন বলেন, সিপিএম যদি বামপন্থী হত, তবে আমি দাবি করতাম, বিশ্ব থেকে বামপন্থা শেষ হয়ে যাক। কিন্তু তা নয়। আজকে সিপিএমের বিরুদ্ধে আন্দোলনে এস ইউ সি আই-এর মতো বামপন্থী শক্তিও আছে। এস ইউ সি আই-এর ত্যাগস্বীকার দেখার মতো।

কমরেড প্রভাস ঘোষের ভাষণ

তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জী সহ মঞ্চে উপবিষ্ট নেতৃবৃন্দ, ১৫ বছর আগে এই দিনটিতে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, বিগত ঐতিহাসিক সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, শহীদ পরিবারের শোকার্ত সদস্য যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে এবং এছাড়াও দীর্ঘদিন ধরে এ রাজ্যে ও বাইরে বিভিন্ন গণআন্দোলনে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, নকশালপন্থী আন্দোলনে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, আমাদের দলের ১৫২ জন নেতা-কর্মী যাঁরা শহীদ হয়েছেন, প্রত্যেকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি কয়েকটা কথা বলছি। আজ আপনাদের এই সমাবেশের দাবি হচ্ছে, গণতন্ত্র বাঁচাও। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কোন গণতন্ত্র, কার গণতন্ত্র? একটা হচ্ছে দেশের অত্যাচারিত, শোষিত শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত জনগণ যাঁরা বাঁচার দাবিতে, জনগণের দাবিতে লড়াই করছেন, অত্যাচারিত হচ্ছেন, শহীদ হচ্ছেন, তাঁদের এই লড়াই করার অধিকার প্রতিষ্ঠা করার গণতন্ত্র। আরেকটা হচ্ছে, জনগণের এই লড়াইকে দমন করার জন্য শাসকদের অত্যাচার ও খুন করার গণতন্ত্র। অতীতে কংগ্রেস খুন করেছে এবং বর্তমানে সিপিএম খুন করছে। তাদের দাবি হচ্ছে, জনগণের এই লড়াই-আন্দোলন অগণতান্ত্রিক, গণতন্ত্রবিরোধী; আন্দোলনকারীরা অশান্তি সৃষ্টি করছে। আর তারা নিজেরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকার, তারা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, তার সংবিধান ও আইন মেনে আন্দোলন দমন করছে। অতএব আজকের দিনে দুই ধরনের গণতন্ত্র আছে। একটা হল টাটা-বিড়লা-আম্বানিদের গণতন্ত্র, পুঁজিপতিদের শোষণ-লুণ্ঠনের স্বার্থে গণতন্ত্র। এদের হয়ে যারা কাজ করছে কেন্দ্রীয় সরকারে, বিভিন্ন রাজ্য সরকারে, যেমন এখানে সিপিএম সরকার, তাদের গণতন্ত্র শোষিত জনগণের বিরুদ্ধে শোষকের গণতন্ত্র। যে আমেরিকা ইরাক ধ্বংস করছে, তার প্রেসিডেন্ট বুশ বলছে ইরাকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যই তারা আক্রমণ চালাচ্ছে। ফলে শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় গণতন্ত্র কোন শ্রেণীর স্বার্থে — সে কথা আপনাদের বুঝতে হবে। এই বিচার থেকে সিঙ্গুরে যাঁরা লড়েছেন, নন্দীগ্রামে লড়েছেন, তাঁরাই সত্যিকারের গণতন্ত্রের ঝাণ্ডা উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। আর যারা একে দমন করেছে, খুন করেছে, তারা হচ্ছে গণতন্ত্রবিরোধী ফ্যাসিস্টিক শক্তি। তারা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানিতেহিটলারের শাসন শেষ হলেও ফ্যাসিবাদ ধ্বংস হয়ে যায়নি। আজও দেশে দেশে, আমাদের দেশেও সর্বত্রই গণতন্ত্র হত্যা করছে এই ফ্যাসিস্টসুলভ শক্তিরাই।

আপনারা জানেন, '৭৭ সাল থেকে আমাদের দল এস ইউ সি আই সিপিএম সরকারের বিরুদ্ধে লড়ছে। আমাদের বহু কর্মী খুন হয়েছে, প্রাণ দিয়েছে। মমতা ব্যানার্জী যখন লড়ছেন '৯০ সাল থেকে, আমরাও পাশাপাশি লড়েছি। '৯০ সালে তিনি যখন মার খেয়ে মরণাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে, সেসময় আমাদের আন্দোলনে কিশোর কর্মী মাধাই হালদার পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েছেন ৩ ১ আগস্ট। এই ভাবে পাশাপাশি আমাদের ও তৃণমূলের আন্দোলন চলতে চলতেই এবার সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রামের আন্দোলন আমাদের আঞ্চলিক স্তরে একত্র করেছে। তারপর নন্দীগ্রামে ফ্যাসিস্ট অত্যাচার দেখে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজ্যস্তরে জোটবদ্ধ হয়েছি। আমরা মার্কসবাদী দল, আমরা বামপন্থার ঝাণ্ডা নিয়ে চলি, আমরা সিপিএমের এই ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে তৃণমূলের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি।

আমি বলতে চাই, আপনারা সিপিএম-কে দেখে মার্কসবাদকে, বামপন্থাকে ভুল বুঝবেন না। যেমন গান্ধীবাদে থাকে ভণ্ড এবং খাঁটি, মার্কসবাদেও তেমনই ভণ্ড মার্কসবাদী আছে, খাঁটি মার্কসবাদী আছে। সিপিএম কোনদিনই যথার্থ মার্কসবাদী ছিল না। এরা ভণ্ড মার্কসবাদী। অতীতে এরা যতটুকু বামপন্থার চর্চা করত তাকেও আজ পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের কাছে বিসর্জন দিয়েছে গদির লালসায়। আপনারা দেখুন দিল্লিতে এখন কী হচ্ছে। সেখানেও এখন গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা গণতন্ত্রের মহাযজ্ঞ করছে। সেখানে কে কুর্সিতে থাকবে, কে কাকে ফেলবে, কে কাকে কিনবে, বিকৃত লালঝাণ্ডা, তেরঙা ঝাণ্ডা, গেরুয়া ঝাণ্ডা, সকলেই সেজন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। এরাও দাবি করে তারা গণতন্ত্রের স্বার্থেই এসব করছে, জনগণের স্বার্থেই করছে। আজকে দিল্লিতে এম পি কেনাবেচা হচ্ছে। ২৫ কোটি, ৩০ কোটি, ৫০ কোটি টাকা দাম উঠছে, মন্ত্রীত্বও বিক্রি হচ্ছে। গোটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউস নেমে গেছে, গোটা পার্লামেন্টারি ডেমোক্র্যাসি বাজার অর্থনীতির পণ্যে দাঁড়িয়েছে। ফলে আপনাদের ঠিক করতে হবে, আপনারা কোন গণতন্ত্রের পক্ষে। আমরা মনে করি আন্দোলন চাই, লড়াই চাই, লড়াই ছাড়া কোনও দাবি আদায় হয়নি, হবে না। নন্দীগ্রামের জনগণ, এম এল এ-এম পি-র জোরে দাবি আদায় করেনি, সরকারের জোরে আদায় করেনি, হাইকোর্টের রায়েও আদায় করেনি। রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, লড়াই করে দাবি আদায় করেছে। নির্বাচনে সাফল্যও এসেছে এই আন্দোলনের জন্যই। জনগণের দাবি আদায় করতে হলে এই লড়াই-ই একমাত্র পথ। নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুরের মতো গণকমিটি সর্বত্র গঠন করতে হবে। সিঙ্গুরেও দাবি আদায় করতে হলে লাগাতার লড়াই করতে হবে। এই লড়াইয়ের প্রয়োজনেই আমরা জোটবদ্ধ হয়েছি, নিছক ভোটের স্বার্থে নয়।

আর যে কথা আমি বলতে চাই, সিপিএম পরমাণু চুক্তি নিয়ে আজ ভণ্ডামি করছে। সিপিএম কি জানে না, যে টাটাকে তারা সিঙ্গুরে এনেছে, সেই টাটা-আম্বানি-বিড়লারা আজকে বিদেশে পুঁজি বিনিয়োগ করছে। এরা হচ্ছে মাল্টিন্যাশনাল, ভারতবর্ষের পুঁজিপতিরা নিজেরাই আজ সাম্রাজ্যবাদী হয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে হাত মিলিয়েছে। ভারতবর্ষ চাইছে বিশ্বে একটা মহাশক্তি হতে। এজন্যই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে হাত মিলিয়ে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামরিক চুক্তি করছে। পরমাণু চুক্তিও এই জন্যই করছে। সিপিএম এ রাজ্যে মার্কিন পুঁজিকে কি ডাকেনি? রাইটার্স বিল্ডিংয়ে, আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে মার্কিন পুঁজিপতিদের আনাগোনা, কিসিঙ্গারের যাতায়াত, সিআইএ-এর এজেন্টদের আনাগোনা চলছে। এটা কি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য? ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় ম্যাকনামারা কলকাতায় নামতে পারেনি বামপন্থী দল ও জনগণের বিক্ষোভে। অথচ রাজ্যে তখন কংগ্রেস সরকার ছিল। আর আজ এখানে সিপিএম সরকারে থাকার সময় কলাইকুণ্ডাতে ভারতীয় ও মার্কিন সেনার বিমান মহড়া হল কী করে? সিপিএম কি সেটা অ্যালাও করেনি? ২০০৫ সালেই পরমাণু চুক্তির কথা হয়েছে, তা কি সিপিএম জানত না? তারা তখন তীব্র বাধা দিলে, বাইরে আন্দোলন করলে কংগ্রেস কি এত দূর যেতে পারত? এখন পার্লামেন্ট ভোটের দিকে তাকিয়ে সিপিএম মহা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী হিসাবে নিজেদের জাহির করছে, আর ভোটের আগে কংগ্রেসীদের সাথে দূরত্ব সৃষ্টি করতে চাইছে। এই সিপিএম আজ বিজেপির সাথে হাত মিলিয়ে দিল্লিতে কংগ্রেস সরকারকে ফেলছে। পরে সুবিধা বুঝে আবার কংগ্রেস বা বিজেপি, না হয় মায়াবতী বা অন্য কারোর সাথে হাত মেলাবে। কংগ্রেস সরকারের দায়বদ্ধতা ভারতের কর্পোরেট পুঁজির কাছে। তাদের সন্তুষ্ট করতে এই চুক্তি তাকে করতেই হবে।

ফলে আমি বলতে চাই, গণকমিটি গঠন করে লড়াই-আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। এই লড়াই গান্ধীবাদের পথে হবে, না মার্কসবাদের পথে হবে, আন্দোলনের পথেই তা ঠিক হবে। জনগণের জীবনের সমস্যা পার্লামেন্টের মধ্য দিয়ে সমাধান হবে, না পুঁজিবাদবিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবে পথে হবে — জনগণই তা ঠিক করবে, জনগণের চেতনাই ঠিক করবে।

পরিশেষে কমরেড প্রভাস ঘোষ আগামী ১১ আগস্ট শহীদ ক্ষুদিরামের আত্মোৎসর্গের শতবর্ষ পূর্তির দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করার জন্য উপস্থিত জনগণকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, ঐ দিন আপনারা ঘরে ঘরে ক্ষুদিরামের ছবিতে মাল্যদান করে এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে এই মহান বিপ্লবীর প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

স্থায়ী বন্যা প্রতিরোধের দাবিতে বিক্ষোভ

স্থায়ী বন্যা প্রতিরোধে কেলেঘাই-কপালেশ্বরী-বাগুই নদী সংস্কার প্রকল্প ও ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান পুনর্মূল্যায়ন করে রূপায়ণের দাবিতে মেদিনীপুর জেলা বন্যা-ভাঙন-খরা প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে ১৭ জুলাই প্রায় ৩ সহস্রাধিক বন্যাদুর্গত নারী-পুরুষ সেচ ও জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান এবং দাবিপত্র পেশ করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন, কমিটির সাধারণ সম্পাদক পঞ্চানন প্রধান, সহ সভাপতি যড়ানন পণ্ডা, সতীশ চন্দ্র পাল, দিলীপ মাইতি এবং কোষাধ্যক্ষ জগন্নাথ দাস ও অফিস সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়েক। স্মারকলিপিতে স্থায়ী বন্যা প্রতিরোধ, বন্যায় গৃহহারাদের এক লক্ষ ও আংশিক ক্ষতিগ্রস্তদের ৫০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান, কৃষিবিদ্যুতের বিল মকুব, আগামী চাষের ফসল না ওঠা পর্যন্ত খাদ্য সরবরাহ এবং বন্যাদুর্গত এলাকা ঘোষণা করে সকল সরকারি সুযোগ সুবিধা প্রদানের দাবি জানানো হয়। সেচ দপ্তরের অধীক্ষক বাস্তুকার এ বিষয়ে দ্রুত মিটিং ডেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ডি পি আর পাঠানোর আশ্বাস দেন। বন্যাদুর্গতদের আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন, বিশিষ্ট নদীবিজ্ঞানী ও কমিটির সহ সভাপতি ডঃ কল্যাণ রুদ্র, খড়্গপুর আই আই টি-র বিজ্ঞানী ডঃ সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মেদিনীপুর সুরক্ষা সমিতির সম্পাদক তীর্থঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সভা শেষে কমিটির সম্পাদক পঞ্চানন প্রধান, ২৫ জুলাই বন্যাপ্লাবিত জেলার সমস্ত গ্রামগুলিতে বেদি স্থাপন করে সকাল ৮টায় মৃত ব্যক্তিদের স্মরণে শোক জ্ঞাপন করার আহ্বান জানান।

ওড়িশার র‍্যাভেনশ বিশ্ববিদ্যালয়ে এ আই ডি এস ও-র আন্দোলনের জয়

ওড়িশার ঐতিহ্যমণ্ডিত র‍্যাভেনশ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রাজ্যের বিজেপি সরকারের শিক্ষানীতি অনুসরণ করে একদিকে ৫০-৬০ শতাংশ আসন কমাচ্ছে, অপরদিকে অধিকাংশ আসন সেল্ফ ফিনান্সিংয়ের অন্তর্ভুক্ত করে ছাত্রসমাজকে শিক্ষার আঙিনা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করছে। সেল্ফ ফিনান্সিং কোর্সের লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ভর্তি বাস্তবে সাধারণ ঘরের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিতই করবে। এর প্রতিবাদে সারা জুন মাস ধরে এ আই ডি এস ও লাগাতার আন্দোলন গড়ে তোলে।

১৯৮৬ সালে রাজীব গান্ধী প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি এবং ১৯৯১ সালে উদার অর্থনীতির পরিপূরক হিসাবে শিক্ষার ব্যবসায়ীকরণ শুরু হয় এদেশে। ছাত্রবিরোধী এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ছাত্ররা রেজিস্ট্রারের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানায়। এ আই ডি এস ও-র নেতৃত্বে আন্দোলন চলতে থাকে লাগাতার। তাতেও কর্তৃপক্ষ দাবি না মানায় শুরু হয় সহউপাচার্যকে ঘেরাও এবং বিক্ষোভ। ছাত্র আন্দোলন ও জনমতের চাপে অবশেষে উদাসীন কর্তৃপক্ষ দাবি মানতে বাধ্য হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in